বাংলার জলছবি

আবদুল জব্বার

পরিবেশক
নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ
নববর্ষ, ১৩৬৭

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং
২৬ বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা ৭০০০২৯

প্রচ্ছদপট
গৌতম রায়

মুদ্রাকর
সনাতন হাজরা
প্রভাবতী প্রেস
৬৭ শিশির ভাদুড়ী সরণী
কলকাতা ৭০০০০৬

পাঁচ-সাত মাইলের মধ্যে কোনো মানুষজনের বসতি নেই। কেবল বন, খালবিল, নদী—পলিপড়া থকথকে চকচকে কাদা, কাঁটাগাছ, সাপ, কুমীর, কচ্ছপ, কাঁকড়া, মাছ আর পাখি।

জঙ্গলে কখনও কখনও বাঁদর আর হনুমানের দল আসে। মধুর চাক ভেঙে খেয়ে লুঠ করে দিয়ে যায়। গাছভরা শুকনো নারকোলের কাঁদি। ঝরে পড়ে তলায়। হনুমান বাঁদরদের অত বুদ্ধি সত্ত্বেও দাঁত দিয়ে নারকোল ছাড়িয়ে মালা ভেঙে কুরে খেতে জানে না।

বাঁদর-হনুমানের মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ, ওরা নাকি মানুষেরই জাত!

গোলপাতায় ছাওয়া কুঁড়েঘরের দাবায় বসে থাকে লায়লা। সুঁদরী-গাছের ডালে বসা হনুমানগুলোর কীর্তিকলাপ দেখে। বীরের কোলে ঢলে পড়ে উকুন বাছায় তার একশো দেড়শো বউয়ের মধ্যে একজন। নতুন কোনো বীর হনুমান এলে তার সঙ্গে দলের বীর হনুমানের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পুরনো বীর হেরে গেলে নতুন বীর সব বউগুলোকে দখল করে। সমস্ত বাচ্চাগুলোকে মেরে দেয়। এমন কি গর্ভস্থ বাচ্চা-গুলোকেও। অন্যের ঔরসজাত সন্তান সে দলের মধ্যে রাখবে না।

চারদিকে গরান কাঠের ঘের দেওয়া বেড়ার মধ্যে ঘর। জঙ্গলের মধ্যে ভ্যাপসা গরম। পাখিরা ডাকছে সব সময়। বনমোরগ আর হাঁসের ডাক শোনা যায়। কতদিন ভাত আর রুটি খেতে পায়নি লায়লা তা ভাবতে গেলেও কান্না পায়।

আবদুর রহিম আজ দু বছর তাকে জঙ্গলে এনে রেখেছে। বুড়ো জোতদার ইবরাহিম রফাদান তার অনুগত বর্গাদার ইনসান গাজির মেয়ে লায়লাকে সাদি করতে চেয়েছিল। ইনসান গাজি জমির লোভে রাজি হয়েছিল। লোকলস্কর নিয়ে নৌকো বোঝাই হয়ে বিয়ে করতে যাবার সময় আবদুর রহিম তার দলবল নিয়ে নদীর তীরে উঠতেই

মারপিট দাঙ্গা বাধিয়ে দিল।

জোতদার ইবরাহিমের ভুঁড়ি বেরিয়ে গেল রহিমের বর্শার চোটে। মাথার পাগড়ি খুলে তার পেট বেঁধে দেওয়া হল। ইনসান গাজির ঘর পুড়ে গেল।

আবত্বর রহিম নৌকোয় করে লায়লাকে নিয়ে পালিয়ে এলো গভীর জঙ্গলের মধ্যে।

সাগরেদদের সে সরিয়ে দিয়েছিল।

পুলিস তন্ন-তন্ন করে খুঁজেছে, তবু আবত্বর রহিমকে ধরতে পারেনি।

লায়লা আবত্বর রহিমকে ভালবাসত। ছাগল গরুর ঘাস কাটতে যেত সে আল থেকে। আর রহিম আসত শালতি ঠেলে হোগলার জঙ্গল চিরে।

প্রথম যেদিন আসে ভাবতে গেলে এখনও শিউরে উঠে আতঙ্কে কেমন যেন অবশ হয়ে যায় সে।

ঘাস কাটতে কাটতে সোজা হয়ে উঠে হঠাৎ দেখল সে ফরসা চেহারার গলায় লাল চৌকো তক্তি ঝোলানো একমাথা জংলী চুল ভরা সুন্দর পাটল চোখের জোয়ান সুঠাম পুরুষটিকে। তেল-চকচকে এলো গা থেকে ঘাম গড়াচ্ছে। হাতে বর্শা।

বলল, 'এই, কার মেয়ে তুই?'

হাতের কাস্তে মুখের সামনে তুলে তার ভেতর দিয়ে তাকিয়ে দেখল লায়লা। বলল, 'তুই কে আগে বল্!'

'মুই? হে—! দক্ষিণ জঙ্গলের রাজা। নাম আবত্বর রহিম। তোর তো দারুণ চেহারা আর ঢপ আছে লো! চল, তোকে লিয়ে যাই। আয় আমার শালতিতে উঠে আয়।'

লায়লার হাত ধরতে যেতেই কাস্তের ঠোকর মারতে গেল লায়লা। হাত সরিয়ে নিয়ে হাসল সে।

তারপর লায়লা ঘ্যাস ঘ্যাস করে ঘাস কাটতে লাগল। গায়ে তার জামা ছিল না। পাশ থেকে শরীরটা হয়তো দেখা যাচ্ছিল।

রহিম বলল, 'তুই বর্গাদার ইনসার গাজির মেয়ে না?'

'হুঁ।'

'তোর বাপ এক নম্বরের শয়তান, জোতদার ইবরাহিমের থুথুচাটা। তার সঙ্গে জমির লোভে তোর সাদির ঠিকঠাক করেছে জানিস?'

'না। আমার বাপকে গাল দেবে না।'

'সে একটা শুয়োর।'

'হারামি—' বলেই কাস্তে ছুঁড়ল লায়লা।

পাশ ফিরল রহিম। কাস্তেটা আলে গেঁথে গিয়ে মাথাটা কিছুক্ষণ এদিক ওদিক করে নড়ল। লাগলে অনেকখানি গেঁথে যেত।

রহিম হেসে বলল, 'বা রে তেজি মেয়ে! তোকে তো আমার চাই-ই।'

শালতি ঠেলে কাছে আনল রহিম। লায়লার হাত ধরল। লায়লা কামড়ে ধরল হাতে। দাঁত বসিয়ে দিল। তারপর ছেড়ে দিতে দেখল রক্ত ঝরে বেরুচ্ছে। কিন্তু আবদুর রহিম কিছু বলল না। তেমনি সুন্দর কুটিল দাঁত মেলে হাসল। হালকা গোঁফদাড়িতে কেমন রূঢ় রুক্ষতা! হঠাৎ শালতি ঠেলে তীরবেগে বেরিয়ে গেল আবদুর রহিম।

তার সেই যাওয়ার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে ছিল লায়লা।

যাবার পর সে ভাবল লোকটা যদি তাকে নিয়ে চলে যেত ভাল হত। বাপ তার বুড়ো জোতদারের সঙ্গে বিয়ের ঠিক করেছে। না করলেও এ তল্লাটে টিকতে পারবে না। জমির ফসল লুঠ করে দেবে। ঘর, ধানের গোলা বা গাদা পুড়িয়ে দেবে।

ঘাস নিয়ে ডিঙি ঠেলে বাড়িতে ফিরে মনমরা হয়ে রইল লায়লা।

তারপর প্রতিদিন সে ঘাস কাটতে এসেছে, রহিমের আবির্ভাব আশা করেছে, কিন্তু রহিম আসেনি। তবে কি তার হাতে কামড়ে দেওয়া ভুল হয়েছে! মাকে বলেছিল সে আবদুর রহিমের কথা। মা শুনে আঁতকে উঠে বলেছিল, 'ওলো, সে যে ডাকাত সর্দার! তার তুই কোথা দেখা পেলি?' লায়লা গোপন করল। বলল, 'অন্য লোক তার কথা বলছিল'।

আর একদিন ঘাস কাটতে এসে পদ্মের ট্যাপ তুলে এনে খাচ্ছিল

লায়লা গাছের নিচের আড়ালে বসে। দূরে খানিকটা খানিকটা ছাবকা ছাবকা জঙ্গল। জলাভূমি। খাল। পাখির ঝাঁক উড়ে বসছে। এক-পশলা বৃষ্টি এসে ভিজিয়ে দিয়ে গেল। ইনসান গাজি নৌকো বোঝাই মাল নিয়ে হাটে গেছে বিক্রি করতে। তার চাচা গেছে মধু ভাঙতে মউলেদের নিয়ে সোঁদরবনে। মা গেছে মামাদের বাড়ি। লায়লাকে বাকুলে থাকতে বলে গেছে। দুটো ভাইবোনকে বাড়িতে রেখে ঘাস কাটার নাম করে ডিঙি বেয়ে চলে এসেছে লায়লা এই বাদায়। ওদিকে আকাট শোলাবন। হোগলাবন। খানিকটা দূরে ঐ ওদিকের পাড়ার বাগদি মেয়েরা শামুক তুলতে এসে কলবল করছে। তারা মাছও ধরছে।

আবদুর রহিমকে আসতে দেখল লায়লা। শরখড়ির জঙ্গলের ভেতর থেকে সে বেরিয়ে এলো। বলল, 'রহিমের জন্যে অপেক্ষা করছ নাকি?'

লায়লা বলল, 'বয়ে গেছে!'

'আজ আর কামড়াবে না, লক্ষ্মী মেয়ে।' রহিম তাকে হাত বাড়িয়ে ধরল। নিজের শালতিতে টেনে আনল। 'পড়ে যাব পড়ে যাব' বলে হাসল, বাধা দিল বসে পড়ে লায়লা। কিন্তু নিজেই সে কখন উঠে এলো আবদুর রহিমের শালতিতে। তারপর রহিম নিয়ে এলো তাকে অনেক দূরের গোলপাতার নিবিড় জঙ্গলের ভেতরে।

কি চমৎকার সারি সারি গাছ। সবুজ পাতায় পাতায় বাতাসের ঢেউ। অরণ্যের মধ্যে ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করা যেন। চারদিকে কত রকমের ফুল। কাঁটাগাছ কেটে সাফ করা।

হঠাৎ বাঁদর হনুমানরা ছুটোছুটি করে চারদিকে লাফাতে দৌড়াতে লাগল। হুপহুপ, ক্যাচরম্যাচর শব্দ।

লায়লা হঠাৎ বর্শাটা টেনে নিল। কোমরে আঁচল জড়াল। বাঘ এসেছে? রহিম তো ফিরল না এখনো? কিছু দুর্ঘটনা ঘটেনি তো! জল-পুলিসের লঞ্চ ঘোরাঘুরি করছে কদিন এদিকে।

একদিন সিনেমার শুটিং-এ এসেছিল শহরের কজন লোক। সঙ্গে একটি মেয়ে। আসলে মেয়েটিকে উপভোগ করতে এসেছিল তিনজন

বাবু ফিল্ম তোলার নাম করে।

আবদুর রহিম হঠাৎ এক চরম মুহূর্তে আবির্ভূত হল।

একাই দাবড়ি মেরে দু-চার ঘা দিয়ে ওদের সব লুঠ করে আনল। ক্যামেরা, শাড়ি, খাবার, টিফিনক্যারিয়ার, ঘড়ি, হার, ব্যাগ, রেডিও।

আমি তো আর একা এই জঙ্গলে নেই, আমার এক হাজার দলবল আছে। অন্যায় করার এটা আখড়া নয়। এটা পবিত্র জায়গা। সব কিছু রেখে চলে যাও তোমরা। নইলে কেউ প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে না।

লোকগুলো বড় ভীতু।

সব রেখে দিয়ে ভেড়ার মত লঞ্চে গিয়ে উঠে পালিয়ে গেল।

লায়লা আস্ত একটা বালিহাঁস রান্না করেছে। হাঁড়িপাতিল, মশলা, দেশলাই, ডিশ সবকিছুই আছে এখানে। রহিম একখানা বন্দুকও যোগাড় করেছে। বুলেটও আছে অনেকগুলো।

ওর দলের সঙ্গে মিলিত হয় দূরের এক দ্বীপে। সেই দ্বীপে শুধু নারকোল গাছ। নিজের আড্ডা কাউকে দেখায় না। পাছে লায়লা তার খোয়া যায়।

আবদুর রহিম এল। তাকে দেখেই হনুমান বাঁদররা অমন লাফালাফি করছিল। দুটো নারকোল আর হাঁসের মাংস খেলো দুজনে। লায়লা বলল, 'তুমি চাল যোগাড় কর, না-হয় আটা। কতদিন যে ভাতরুটি খাইনি!'

'এই শালী, এই সেদিন পোলাও, পাঁউরুটি, বিস্কুট, আপেল আঙুর খেলি—সিনেমার শুটিং করা লোকরা ফেলে গিয়েছিল।'

লায়লা স্বীকার করল। বলল, 'হাঁ, শহরের বাবুরা খায় বটে।'

বিকালে বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে গেল আবদুর রহিম।

সন্ধ্যা পর্যন্ত সে এল না।

মোম জ্বেলে ঘরের মধ্যে বসে রইল লায়লা।

জঙ্গলে কত রকম পাখির ডাক।

একা তার সময় কাটে না।

রাত আটটা নাগাদ লঞ্চের ফটফট শব্দ শোনা গেল জঙ্গলের দক্ষিণ-পাশের নদীতে।

যে জঙ্গলে আছে তারা, সেটা একটা বড় দ্বীপের মত। চারদিকে চওড়া গভীর নদী। নদী উপচে বর্ষাকালে জঙ্গল ভেসে যায়। তখন সাপ আসে। মাছ খেলা করে। মাচার ওপরে বসে থাকে লায়লা। এখানে মশা আছে, ডাঁশমাছি আছে, জোঁক আছে। বোলতা, ভীমরুল আছে। নদীর চরের পলি জলকাদায় সাগরবিছে লাঙুল খাড়া করে থাকে, না দেখে পা তুলে দিলে গেঁথে যায়, প্রচণ্ড জ্বর হয় ব্যথায়।

বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পায় লায়লা। চমকে ওঠে সে। হঠাৎ একটা হল্লা।

তারপর সেই বাতাসের গর্জন। পাখির ডাকের জগৎজোড়া শব্দ।

মাঝরাত্রেও রহিম এলো না।

লায়লা শঙ্কিত হল। তাহলে কি সে ধরা পড়ল?

সকাল হল। তবুও রহিম আসে না। দুপুরেও না। এবার লায়লা কাঁদতে লাগল। কি করবে সে এখন? একাদিক্রমে প্রচণ্ড সুখ সে পেয়েছিল—তারপর কি দুখ! কেমন করে সে লোকালয়ে ফিরে যাবে? তার বাপ নাকি মারা গেছে। জমিজমা কমিউনিস্ট ভাগচাষীরা লাল ঝাণ্ডা পুঁতে দখল করে নিয়েছে। বাপ তাদের হাতেই মারা যায়।

পায়ে পায়ে এখন আতঙ্ক আর ভয়। গর্ভে তার সন্তান। তবু বর্শা নিয়ে বের হতে হয় লায়লাকে। জঙ্গল থেকে নদীর তীরে এসে দাঁড়ায়। ধু-ধু সাদা নদী। জল আর জল। আর দূরে দূরে সবুজ জঙ্গল। মানুষ নেই, নৌকো নেই। এই অরণ্য থেকে কেমন করে সে রক্ষা পাবে?

সপ্তাহ গেল, মাস গেল, তবুও ফিরল না আবদুর রহিম।

লায়লা বুঝল, হয় তাকে পুলিস ধরে নিয়ে গেছে, বেদম মারপিট করে জেলে ঢুকিয়েছে, নয়তো লুঠ দাঙ্গায় মারা গেছে। তার শরীর ভেসে গেছে নদী থেকে সাগরে। হাঙর, বোয়াল, শিলং মাছে তার শরীর খেয়ে নিয়েছে।

নারকোল আর হাঁস মুরগীর ডিম সংগ্রহ করে খেয়ে আর কতদিন

বাঁচবে ? আগুন ফুরিয়ে গেছে।

অন্ধকারে বসে-শুয়ে থাকে লায়লা।

ক্রমেই তার শরীর ভারী হয়ে যাচ্ছে।

তার পা চলে না—অবশ হয়ে আসে।

মাসের পর মাস কেটে যেতে লাগল।

একদিন তার প্রসববেদনা উঠল। এক দিন এক রাতে প্রচণ্ড যন্ত্রণাভোগের পর সন্তান প্রসব করল লায়লা। জ্ঞান হতে ফিরে দেখল তার খোকা হয়েছে। কাঁদছে ছেলেটা ওঁ ওঁ শব্দ করে। তাকে স্তন দিল। কি অপূর্ব আরাম! ফুল পড়ে যেতে সে উঠল। বাচ্চার নাড়ী কেটে বেঁধে দিল। নিজেই সাফ করল ঘরকন্না। নাড়ী ফুল গর্ত খুঁড়ে পুঁতে ফেলল।

মা হবার পর পাঁচ বছর জঙ্গলে কেটে গেল লায়লার। বস্ত্র বলে আর তার কাছে কিছু তখন ছিল না বলে নদীর চরের ফাঁকা জায়গায় সে আসত না। সম্পূর্ণ নগ্ন নারী সে এখন। জঙ্গল থেকে বনমানবীর মতো খাদ্য সংগ্রহ করে। কাটারি আর বর্শাই তার ভরসা। গোল-পাতার গাছ কেটে ফেলে তার পাতা এনে ঘর ছেয়েছে। আঁকশি তৈরি করে নারকোল আর মধুর চাক ভাঙে।

ছেলেকে নিয়ে খায় আর ঘুমোয়।

পুরনো স্মৃতির কথা ভাবে। শীতের সময় বড় কষ্ট হয়। গাছের ছাল আর পাতা গায়ে চাপা দেয়।

এমনি একদিন ডাণ্ডা ছুঁড়ে বালিহাঁস মেরে এনে পালক ছাড়াচ্ছিল লায়লা ছেলেকে নিয়ে যখন দুপুরবেলা কাঁচা মাংস নোনা জলে ধুয়ে নিতে এসেছে খাবার জন্যে হঠাৎ আবদুর রহিমের ডাক শোনা গেল, 'লায়লা!'

লায়লা চমকে উঠে মুখ ফেরাল।

ছেলেটাও তাকাল। জীবনে সে দ্বিতীয় এই একটি মানুষকে দেখল

লায়লা আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়েও দাঁড়াল না

সে প্রায় সম্পূর্ণ নগ্ন

আবদুর রহিম বেড়া খুলে ভেতরে এল। বলল, 'জেলে ছিলাম। তুমি এতদিন এখানে আছ? এটা আমার বাচ্চা! হায় রে!'

লায়লাকে আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করার পর বাচ্চাটা কোলে তুলে নিয়ে নাচাতে লাগল আবদুর রহিম। বলল, 'ডাকাতের বেটা ডাকাত। তুই বড় হয়ে ওঠ্ বেটা। বাপ-বেটায় লড়াই করে বাঁচব।'

লায়লা রহিমের কোমর থেকে গামছায় বাঁধা নতুন শাড়িখানা পড়ল। বলল, 'এখানে আর নয়, চলো মানুষের সমাজে ফিরে যাই।'

পাকদণ্ডী

তরাই অঞ্চলের পাহাড়ী জঙ্গলে ঝড়বৃষ্টি নেমেছিল নভেম্বরের শীতের সন্ধ্যায়। বজ্রপাত হচ্ছিল ঘন-ঘন।

মিঃ উইলিয়ম কিং পাহাড়ী কটেজের ঝুলন্ত বারান্দা থেকে ভেতরে এসে বসে পানাহার করছিলেন কতকটা ঝিমোনো ভাব নিয়ে।

নাতাশা নামমাত্র একটু মটন-চপ আর চিকেন রোস্ট নিয়েছিল—একগ্লাস হুইস্কি খেয়েছে জল মিশিয়ে স্বামীর সঙ্গে বসে—একটু খেতে হয় সেজন্যেই। আজ তার মনটা তেমন ভাল নেই। মা'র চিঠি এসেছে, তাঁর শরীর নাকি ভাল নেই। বাবা বাতে রোগী। পেনসনের টাকায় চলে না। ভাইটি ভ্যাগাবণ্ড। তালতলা এলাকার পলেস্তারা খসা বহু পুরোনো বাড়ি ভরা এ্যাংলো পাড়ায় একটা স্যাঁতসেঁতে নিচের তলার ঘরে তাঁরা পড়ে আছে। রাজত্ব গেল, ক্ষয়িষ্ণু এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সমাজ কলকাতায় এখন সবকিছু হারিয়ে ভিখারী দশায় পড়ে আছে।

বজ্রপাত হতে চমকে উঠে যীশুর ছবিটার দিকে তাকিয়ে নাতাশা বুকের ওপরে ক্রুশচিহ্ন আঁকল। মিঃ কিং একটু নড়লেন, কাঁচের ওপরে বিদ্যুতের ঝিলিক দেখে আগেই আঁচ করে নিয়েছিলেন বাজটা পড়বে খুব জোরে। হুইস্কির পাত্রটা শেষ করে বললেন একটু জড়ানো গলায়, 'আটটা বাজল, আদম এখনো ফিরল না। কাঠ-চেরাই কারখানা

থেকে যাবে আমার ফরেস্ট অফিসে, সেখান থেকে ডেয়ারী ফার্মে, তারপর সোজা চলে আসার কথা। পথে যদি ভেজে, কোথাও না দাঁড়ায়, তো ঘোড়াটা ঠাণ্ডায় মরবে।'

নাতাশা একবার চোখ তুলে তাকাল। কিং সে দৃষ্টির অর্থ বুঝে নিয়ে বললেন, 'অবশ্য বেটা আদমও শীতে ঠকঠক করে কাঁপবে। তবে নিগ্রোর মতো ওর চেহারাটা কালো গ্র্যানাইট পাথর দিয়ে গড়া—রোদ বৃষ্টি শীতে ওর কিছু হয় না। ডেয়ারী ফার্মে যে হরিয়ানা বুলটা আনা হয়েছে তার শিং ধরে বেটা এমন ঘাড় মট্‌কে দিলে যে…' হিঁকিয়ে হিঁকিয়ে হাসতে লাগলেন মিঃ কিং। জুলপিতে তাঁর রুপোলী চুল। কলকাতার একটি বারে আলাপ হয়েছিল। বারের ম্যানেজমেণ্টের চাকরি করত নাতাশা। তাকে মনে ধরে গেল। সঙ্গে নিয়ে বেড়ালেন। খরচ-খরচাও করলেন অনেক। পোশাক-আশাক কিনে দিলেন। খাওয়ালেন। সিনেমা থিয়েটার দেখালেন। অনেক বড় বড় স্বপ্ন দেখালেন।

মিঃ কিং দিল্লীতে মানুষ। আগের বউকে ডিভোর্স করেছেন। দুটো মেয়ে আছে তার সঙ্গে। মাসে তাদের জন্য পাঁচশো টাকা পাঠিয়ে দেন। বাবা-মাকে দেন হাজার টাকা। একশো একর একটা জঙ্গল কেনার পর কাঠ-চেরাই কারখানা খুলছেন। ডেয়ারী ফার্ম করেছেন, পঞ্চাশটি হরিয়ানা আর জার্সি গরু আছে সেখানে। গেস্ট হাউস আর ফরেস্ট অফিস করেছেন জঙ্গলের গায়ে। অপূর্ব সুন্দর দোতলা একটি বাংলো করেছেন পাহাড়ী টিলার ওপরে। কিছু জমিতে তামাক আর ভুট্টা চাষ করান। আঙুর ক্ষেত আছে খানিকটা। দুশো আড়াইশো লোককে কাজ করান তিনি। কোটি টাকার মালিক।

এ-হেন কিং সাহেবের বিয়ের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল নাতাশা। নাতাশা দেখতে ভাল। সুঠাম সুন্দর চেহারা। কালো চুল। কালো চোখের তারা। নাকটিও চমৎকার। আবহাওয়ার গুণে কিছুটা বাঙালী-পনাও আছে তার হাবভাবে।

ঝড়ের শব্দে আদমের ডাক বা ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি প্রথমে কানে

পৌঁছল না মিঃ কিংয়ের। তার ওপর কলিং বেলটা খারাপ হয়ে গেছে।

উইণ্ডো গ্লাসের ওপর টর্চের আলো পড়তেই তিনি উঠে পড়লেন। বললেন, 'ঐ যে এসে গেছে শয়তানটা!'

মিঃ কিং নেমে আসার পর ঘোড়া থেকে নামল আদম। ভিজে শরীর থেকে জল ঝরছে। মাথার চুল নেমে এসেছে মুখের ওপরে। ব্যাগটা হাতে দিল সে মনিবের।

কিং বললেন, 'টাকাগুলো ভেজেনি তো রে শয়তান! যা ঘোড়াটাকে গা মুছিয়ে একটু আগুন করে তাজা কর, আর তুইও চাঙ্গা হ। যা, এটা নিয়ে যা।'

মিঃ কিং একটা চ্যাপ্টা বোতল এগিয়ে দিলেন।

সাদা দাঁত মেলে কৃতজ্ঞভাবে নিল আদম। জামাটা আগেই খুলে ফেলেছিল সে। নিংড়ে তাই দিয়ে মাদী অস্ট্রেলিয়ান ঘোড়াটার পিঠ গা মুছিয়ে দিচ্ছিল। ছাঁচ থেকে ঝরঝর করে জল ঝরছে। ভেতরে দাঁড়িয়ে আছে ঘোড়াটা। মনিব মুখে একবার হাত বুলোলেন।

বাল্বের আলোয় ওদের কেমন যেন ভূতুড়ে দেখাচ্ছিল। নাতাশা নিচে নেমে এসে পর্দার পাশে দাঁড়িয়েছিল। হাতে তার বোনার কাঠি : আদমের বুকভরা কালো লোম, পেশীবহুল চেহারায় তার দৃষ্টি ছিল আবদ্ধ হয়ে।

আদম ঘোড়া নিয়ে উত্তর দিকের আস্তাবলে চলে গেল।

আদমের বয়স পঁচিশ হবে বোধহয়। চেহারা বেশ একটু বড়সড় বলে বছর পাঁচেক বেশিও মনে হতে পারে। বিহার আর পশ্চিমবাংলার সীমান্ত এলাকার মানুষ। সাহেবের কাছে আছে পাঁচ বছর হল। ওর ওপরে মিঃ কিংয়ের ষোল আনা ভরসা। সাহেবের ভীষণ বিশ্বস্ত। অনেকটা বন্ধুর মতোও বটে, বিশেষ করে জঙ্গলের মধ্যে বিপদ-আপদের সময়। অনেক সময় সে মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে সাহেবকে রক্ষা করেছে। আদম হিন্দী, বাংলা আর ভাঙা-ভাঙা ইংরেজি জানে। ফরেস্ট অফিসারের সমান ওর মাইনে। টাকা নিয়ে ও মা-বাবার কাছে পাঠিয়ে দেয়। নিজের কোনো রকম বিলাস বাহুল্য নেই।

ধর্ম ওর ইসলাম হলেও কখনো ওকে নামাজ পড়তে দেখা যায় না, ধর্মের ভানও ও করে না। নাতাশা প্রথমে মনে করত ও একটা জন্তু বিশেষ। কিন্তু ওর ওপরে মনিবের এমনি বিশ্বাস যে আকাশ ভেঙে পড়তে পারে, নদী শুকিয়ে যেতে পারে, তবুও আদম বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না।

রাত্রে আহার শেষ করার পর মিঃ কিং বললেন, 'আদমকে ওভাবে আস্তাবল ঘরে ফেলে না রেখে আলাদা একটা বাড়ি করে দিলে ভাল হয়। কারখানার শ্রমিকদের ও শাসায় বলে ওরও শত্রু আছে।—কি হল, আজ তুমি এমন গম্ভীর কেন ?'

'মা'র চিঠি পেয়েছি।'

'হুঁ!'

'কিছু কিছু টাকা যদি পাঠানো যেত, আমি তো চাকরি করে মাসে মাসে তখন দিতাম। যদি মেয়ে হয়ে না জন্মাতাম!'

'বাবা-মার দুঃখ ঘোচাবার জন্যে যদি ছেলেরা জন্মাত তবে তোমার ভাইটাই বা ভ্যাগাবণ্ড হয় কেন ? আচ্ছা, মাসে আড়াইশো কিংবা তিনশো টাকা ওদের পাঠিয়ে দিও। সত্যি বলছ আমার অজ্ঞাতে তুমি দাও না কিছু ?

'একেবারে দিই না বললে ভুল হবে।' নাতাশা বিছানায় এসে স্বামীর শরীর-সংলগ্ন হল।

বাইরে ঝড়ের শব্দ। বৃষ্টি থেমে গেছে।

আদমের খাবার পাঠিয়ে দিয়েছে নাতাশা। অনেক সময়ে ও না-খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ে। বিছানো খড়ের ওপরে কম্বল পাতা ওর বিছানায়। লেপটায় তেল-ময়লা গন্ধ। মশারি থাকলেও ব্যবহার বড় একটা করে না।

মিঃ কিংয়ের কারখানা অঞ্চলে একটা ডাকনাম আছে ; ইউ-কে। ইউ-কে খানিকটা সময় আদর বা আঁচড়া-আঁচড়ি করেন। নাতাশার শরীরে হাত বুলোন। তারপর স্থির হয়ে যান। তার আগে বলেছিলেন, 'দিল্লীতে যাওয়া দরকার। সিমলার মেন অফিস থেকে

মাল সরবরাহ ব্যবস্থাটা ঠিক ঠিক হচ্ছে না। শালা কর্মীগুলো মহা চ্যামোন। সমানে কুকুরের মতো তোষামুদ। কাঠ-চেরাই কারখানায় গণ্ডগোল পাকাতে আদম শায়েস্তা করে দিল।'

নাতাশা বলল, 'সোমরা নামে আদিবাসী একজন কর্মীকে আর পাওয়াই গেল না।'

'চিতাবাঘে নিয়েছে। জঙ্গল এলাকায় বাস্ত্রে অবস্থান ধর্মঘট করলে ঐ রকমই হয়। এখানে নেকড়ে, চিতাবাঘ, হায়েনা, ভালুকের দৌরাত্ম্য। তুমি যেন আমাকে না জানিয়ে একা বাইরে যেও না।'

ইউ-কে প্রৌঢ় মানুষ, হাঁটুতে তাঁর বাত, টাকা পয়সা, হিসেব আর ব্যবসা নিয়েই ব্যস্ত। এক বছর আগে এখানে আনার পর নাতাশাকে ঘোড়ায় চড়িয়ে নিয়ে খুব বেড়িয়েছেন, শিকার করেছেন, আনন্দ-উদ্দামতার মধ্যে দিন কেটেছে। তারপর সবটা ঝিমিয়ে গেল। কুলিদের ওপরে নির্যাতন করার ব্যাপারে নাতাশা প্রতিবাদ করেছিল—সেই থেকে যেন সুর কেটে গেছে। ডেয়ারীর ম্যানেজমেন্ট নাতাশার হাত থেকে নিয়ে উত্তরপ্রদেশী একজন বুড়ো মুন্সীজীর হাতে দেওয়া হয়েছে।

সামনের বিসর্পিল রাস্তা দিয়ে কাঠের লরি চলে যাচ্ছে। ভোর-বেলায় বোতল টিন ঝনঝনিয়ে দুধের গাড়ি যাবে আসবে।

ইউ কে ঘুমিয়ে গেছেন।

নাতাশা চেষ্টা করেও ঘুমোতে পারেন না। এয়ার কণ্ডিশনড ঘরে এই শীতের রাতেও চমৎকার একটা ওম্ লাগে। মাথা গুঁজে চোখ বন্ধ করে থেকে সাড়ের শাঁ শাঁ শব্দ শোনে বন্ধ ঘরের মধ্যে। কলকাতার জীবন মনে পড়ে। কত ছেলের সঙ্গে সে মিশেছে। কত ছেলে কত স্বপ্ন দেখাত। এ্যাণ্ডারসন গ্রে তাকে হোমে নিয়ে গিয়ে সেখানে তার স্কটল্যাণ্ডের পৈতৃক প্রাসাদে, ব্যারন-বাড়িতে রাজরানী করবে বলে-ছিল। গ্রের সঙ্গে গির্জায় যেত। প্রার্থনা করত। গান গাইত। তার বুকে মাথা রেখে কতবার চুম্বনে বিভোর হয়েছে, কিন্তু সেই গ্রে হঠাৎ ট্রেন দুর্ঘটনায় মারা গেল। নাতাশা খুব কেঁদেছিল। কান্না যে কত গভীর বেদনার—হৃদয়ের অন্ধকার নীল গহ্বর থেকে বিদ্যুতের মতো

উঠে আসে, আর অবশ করে দেয়, এটা আগে তার জানা ছিল না।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল নাতাশা। প্রেম কাবাভরা গভীর প্রেমের চিঠি আছে কয়েকটি কলকাতার বাড়িতে— মায়ের তোরঙ্গের মধ্যে।

আদম লোকটা নিগ্রো। কালো আদমী। ওর চরিত্রও তেমনি কালো। তাকে 'ম্যাডাম' বলে স্যালুট ঠুকত আগে। এখন শুধু হাসি দিয়ে একটু মাথা নেড়েই সারে সেটা।

একদিন ঝরনায় স্নান করছিল সে একা। বসন ছিল না তার শরীরে। উঁচু পাহাড়ের ওপর থেকে জল পড়ছে; তারপর লাফিয়ে লাফিয়ে স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো গড়িয়ে আসছে। দুপুরের রৌদ্রে রামধনু তৈরি হয় উৎক্ষিপ্ত জলকণার মধ্যে। তারই মধ্যে নেমেছিল নাতাশা। দেখার কেউ নেই এখানে। কারখানার আশে-পাশে কেবল বস্তি জনপদ গড়ে উঠছে।

হঠাৎ দেখল আদম ঘোড়ায় চড়ে দাঁড়িয়ে আছে। দুপুরে সাহেবের লাঞ্চ চলছিল কয়েকদিন ফরেস্ট হাউসেই। সেদিন কিছু নিতে সাহেব কুঠিতে এসেছিল আদম। হয়তো কোনো ফাইল, অথবা চাবি, চেকবই কিংবা কোনো কিছু। আদম স্থির চোখে তার যৌবনসৌষ্ঠব দেখেছিল। মাত্র কয়েক মুহূর্ত। 'ইডিয়ট'—বলে নাতাশা ঘুরে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেছিল, আদম ঘোড়া টগবগিয়ে তখন পাহাড়ের উপত্যকা বেয়ে অনেকখানি দূরে চলে গেছে।

তাড়াতাড়ি চলে এসেছিল নাতাশা। ভেবেছিল হয়তো সাহেব এখনি ফিরবেন। আদম হয়তো বলে দেবে যে সে মেমকে নগ্ন অবস্থায় ঝরনায় স্নান করতে দেখেছে।

কিন্তু তিনদিন পরেও এর কোনোরকম প্রতিক্রিয়া হল না দেখে আদম যখন সকালে ব্রেকফাস্টের সময় সাহেবের সঙ্গে খাচ্ছিল ওর চোখে চোখ রাখল নাতাশা। আদম যেন কেয়ার করল না। অন্য-মনস্ক। দশ হাজার ফুট ওপরে ঘোড়া, গরু মোষ চরাতে বিশ হাজার ফুট ওপরের যে দলটি এসেছে তাদের মধ্যে যেসব সুন্দরী রমণীরা এসেছে, তাদের পেটে নাকি চল্লিশ হাত দড়ি জড়ানো, কানে লহরী

ঝুমকো, আলখাল্লা পরা পুরুষরা চলন্ত অবস্থায় হুক্কার পাইপ টানতে টানতে যায়—এইসব বর্ণনার মধ্যে সাহেবকে মশগুল রাখতে চেষ্টা করে।

বলে, 'ওরা আমাদের রিজার্ভ ফরেস্টের মধ্যে ঢুকলেই এ্যারেস্ট করব স্যার।'

ইউ-কে বললেন, 'অনর্থক ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ নেই। দেবদারু পাইন এসব বড় গাছ তো কাটবে না—হয়তো কিছু শুকনো কাঠ নেবে বা ফাঁকা ঘাসের জায়গায় গরু চরাবে—তবে বসানো ইউক্যালিপ্টাস বা অন্য গাছ যাতে নষ্ট না করে দেখবে।'

নাতাশার ঘুম এলো না। রবিবারের ছুটির দিনটা আদম এলো গায়ে মাত্র একটা কট্‌কী হাফপ্যান্ট পরে রোদে বসে বন্দুক পরিষ্কার করে। ঝুলন্ত বারান্দায় বসে আয়নায় নিজের মুখ দেখতে দেখতে অথবা বই পড়তে পড়তে কিংবা কিছু বুনতে বুনতে ওর তেল-মাখা চকচকে আর পেশীবহুল চেহারার সৌষ্ঠব দেখে নাতাশা। আশ্চর্য ব্যাপার, আদমের কি কোনো রকম যৌন-চেতনা নেই? কই, ওর চাউনিতে তো সে-রকম কিছু ধরা পড়ে না! মাদী ঘোড়ার দেহ দলাই-মলাই করে হুসহাস শব্দ করে, পিঠে চাপড় মেরে। এ্যালসেসিয়ানটার সঙ্গে লাফালাফি দৌড়োদৌড়ি করে লনের ওপরে বল ছুঁড়ে দিয়ে। আদম খুব দ্রুত ছুটতে পারে। লাফায়। গড়ায়। কুকুরটার সঙ্গে জড়াজড়ি করে। ছবির মতো এসব দৃশ্য নাতাশার মনের মধ্যে ভাসে।

উঠে পড়ল নাতাশা। ঘুম এলো না। রাত বারোটা বাজল। দোর খুলে একবার বারান্দায় এলো। ঝড় থেমে গেছে। পাহাড়ের কোলের মেঘ থেকে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। পাহাড়ী অরণ্যের ছবি ভেসে উঠে চকিতেই মিলিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ চোখে পড়ল আস্তাবলের লোহার গেট খোলা পড়ে আছে।

আদমকে কেউ মেরে দিয়ে পালায়নি তো? ওর শত্রু অনেক। ঘোড়াটাকে তো বার করে নিয়ে পালাতেও পারে! হো-মুণ্ডা-সাঁওতাল-নেপালী-পাঞ্জাবী কত রকমের লোক এসেছে এখানে কাজের ধান্ধায়।

অভাবী আদিবাসীরা আছে।

হঠাৎ হায়েনার ডাক শুনতে পাওয়া গেল।

ঘর বন্ধ করে এসে স্বামীর মাথা ধরে একবার নাড়া দিল নাতাশা। মদের নেশায় প্রচণ্ড রকম ঘুমে তখন তিনি বেঘোর।

নাতাশা চাবির গোছাটা নিল একবার। ভাবতে লাগল—নামবে কিনা। পিস্তল হাতে নিয়ে নেমেই গেল সে। এ্যালসেসিয়ানটা ছুটে বেরিয়ে এসে গায়ের ওপরে লাফালাফি শুরু করল। বার দুই ডাকল। তাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এসে আস্তাবল-গেটের মধ্যে ঢুকে গেটটা চাবি দিয়ে বন্ধ করল। কুকুরটা আগেই ছুটে গেল। আস্তাবল-বারান্দায় উঠে হঠাৎ দূরের কোনো কিছুর দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। চিতাবাঘ বা হায়েনাকে দেখতে পেয়েছে না কি? লাফ দিয়ে পড়বে পাহাড়ের ওপরের জঙ্গল থেকে লনের মধ্যে?

নাতাশার বুকের মধ্যে ধ্বক্ ধ্বক্ করছে। তার হাত-পা কাঁপছে। কেন এসেছে সে আস্তাবলে? তাহলে বাইরের দোরে চাবি দিয়ে এলো কেন? পিছনের দরজা খোলা। ঘরে অনেক টাকা, সোনা আর তার অচেতন স্বামী আছে। স্বামীর শত্রু বিস্তর। বিশেষ করে অন্য পার্টির লোক।

আস্তাবলের ভেতরে অন্ধকার। কোথায় সুইচ কে জানে!

ঘোড়াটাকে দেখতে পেল নাতাশা। অন্ধকারে তার অবয়ব মাত্র। গায়ে একবার হাত দিল। কম্বল বাঁধা। ঘোড়াটা ছোলা চিবোচ্ছে। মাথা ঝাঁকিয়ে মুখের শব্দ করল।

নিজের কম্বল গায়ে না দিয়ে ঘোড়ার গায়ে বেঁধে দিয়ে ঠাণ্ডায় ভিজে এসে তবে কি আদম এলো গায়েই পড়ে আছে! ওর ঘরের মধ্যে ঢুকল নাতাশা। পা দুটো তার ঠকঠক করে কাঁপছে। হঠাৎ তার পায়ে কি যেন ঠেকে ঝনঝন করে পড়ে গেল। খাবারের ডিস···

আঁৎকে উঠে প্রায় শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল! তবু তার দু-পা এগিয়ে এসে আদমকে ডাকতে গিয়ে তার স্বর ফুটল না। হাত বাড়িয়ে পাটা ছুঁতেই দেখল আদম পড়ে আছে। বসে পড়ল সে—

হাতটা তার কাঁপতে কাঁপতে উঠে গেল। হাঁটু, পুরুষ্ট মজবুত উরু, কোমর, চর্বিহীন পেট, বুক—মুখ—মাথা···

আদমের চেতনা নেই। সেও মদ খেয়েছে। পুরো এক বোতল ব্রাণ্ডি। ঠাণ্ডায় গা-হাত হিম হয়ে গেছে! নিউমোনিয়া ধরে যেতে পারে। চকিতে উঠে পড়ল নাতাশা। চলে এলো দ্রুত পায়ে। চাবি খুলল। কুকুরটা ন্যাং ন্যাং করে চলে এলো। উপরে এসে দেখল ইউ-কে তেমনি ঘুমাচ্ছেন। নাক ডাকছে তাঁর।

পাশের ঘরে ঢুকে একখানা চাদর আর উটের লোমের কম্বল বার করে নিয়ে নিচে নেমে এলো নাতাশা। এবার তার যেন অনেকটা ভরসা এসে গেছে। একসেলের ছোট টর্চ এনেছে সে। লাইট ফেলে দেখল আদম হরদম তেল-জাতীয় কি একটা মেখেছে—তবুও তার শীতে কুণ্ডলী পাকানো দেহটা অচেতন অবস্থায়—সামনেটা চিৎ হয়ে—নিচের দিকটা পাশ ফিরে পড়ে আছে। পায়ের বুড়ো আঙুল ধরে টান দিয়ে পা দুটো সোজা করে দিল নাতাশা। জেগে উঠছে জড়িয়ে ধরবে, নাকি বোকা হয়ে যাবে! মাথায় করে তুলে নিয়ে গিয়ে মনিবের কাছে হাজির করবে? না, ঝরনায় স্নানের দৃশ্য দেখা গোপন করেছে যখন তখন মনে হয়···

ওর গায়ে চাদর দিয়ে তার ওপরে কম্বলটা পেতে রেখে ফিরে আসার সময় দেখল আদম আজ রাত্রে তার আহার্যের মধ্যে কেবল মাংসটুকুই খেয়েছে! রুটি দুধ তরকারী পড়ে আছে। পড়ে গেছে মেঝেয়।

মদের বোতলটা পড়ে আছে।

ফিরে এসে নাতাশা স্বামীর পাশে শুয়ে পড়ল। তাঁকে জাগাবার চেষ্টা করেও বিফল হল।

গ্রের কথা মনে পড়ল।···

তারপর সে কাঁদতে লাগল নরম বালিশে মুখ গুঁজে।

পরের দিন রবিবার সকালে নাস্তাপানি করার পর মিঃ কিং মোটর নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। দিল্লী যাচ্ছেন তিনি। ফিরতে দু-দিন নাকি দেরি

হবে। আদমকে কড়া শাসনের স্বরে বলে গেলেন, 'সব দিকে চোখ রাখবে, গাড়োয়াল বা কিন্নর মেয়েদের রূপযৌবনের ধাক্কায় যেন পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়িয়ো না।'

আদমের দিকে তাকাতে লজ্জা পেয়ে সে অন্য দিকে মুখ ঘোরাল —যেন চ্যাংড়া ছোকরার মেয়েদের দিকে তাকানোর প্রাথমিক লজ্জা।

সাহেব বেরিয়ে যেতে নাতাশা বলল, 'তুমি তাহলে মেয়েদের পেছনে ঘোর?'

'সাহেব ও-রকম ঠাট্টা করেন।'

'তুমি গত রাত্রে আস্তাবলের গেট খুলে রেখেছিলে কেন?'

'অত ঠাণ্ডায় ভিজে এসে আর মনে নেই। বড় কসুর হয়ে গেছে ম্যাডাম।'

'যদি কোনো শত্রু বা চিতাবাঘ ঢুকে পড়ে তোমাকে ঘায়েল করত?' মিষ্টি হেসে বলল নাতাশা।

কিন্তু গম্ভীর হয়ে অন্য প্রসঙ্গে কথা বলল আদম, 'কম্বল আর চাদর সাহেব না আপনি দিয়ে এসেছিলেন জানি না, সাহেব যদি না দেন তো ও বিষয়ে কথা তুলে বোকা বনব?'

'কোটি টাকার মালিক তাঁর একটা নোকরের গায়ের শীতের চাদর-কম্বল মুড়ি দিয়ে আস্তাবলে যাবেন এতটা তুমি আশা করো কি করে?'

'তাহলে আপনারই কাজ। মহিলাদের বড় দয়ার শরীর। ঠিক আমার মাও ওই রকম। যাক গে, ও-রকম ভাবে যাবেন না—আমার হাজার বিপদ হলেও। কেন না আমাদের মতো লোককে হর-হামেসা কিনতে পাওয়া যায়। তাছাড়া আপনারও ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। বড় মানুষের মন, বালির বাঁধ। দেখলাম তো আগের বৌকে। দুটো বাচ্চা সমেত ডিভোর্স হয়ে গেল।'

'কেন, হয়েছিলটা কি?'

'বলেননি আপনাকে?'

'না। আমি জানতে চাইনি।'

'তাহলে এখন জানতে চাইবেন না। ভবিষ্যতে জানতে পারবেন।'

কথা বলতে বলতে উপরে উঠে এলো নাতাশা। কথা শেষ না করা পর্যন্ত মনিব্‌নীর পিছন থেকে সরে পড়াও ধৃষ্টতা।

নাতাশা ওকে বসতে ইঙ্গিত করে বলল, 'তুমি কলকাতায় গেছ কখনো ?'

'হ্যাঁ ম্যাডাম, অনেকবার গিয়েছি। আমার চাচা-চাচীরা সেখানে আছে। চাচা ড্রাই-ডকে কাজ করে। কেন ম্যাডাম ?'।

'গেলে আমার বৃদ্ধ অসুস্থ দরিদ্র মা-বাবাকে কিছু জিনিসপত্র আর টাকাকড়ি পাঠাতাম।'

'দরিদ্র কথাটা বলবেন না, আমার ভয় করে। আমি খুব গরিব ঘর থেকে এসেছি। সেটা ভুলতে পারি না। জোতদার মহাজনদের হাতে আমার বাবার পিঠের চামড়া উঠে গেছে। তাই আমি দুরবস্থায় পড়ে থাকি। আরাম হারাম হ্যায়।'

'তা বলে নিজের গায়ের কম্বল ঘোড়ার গায়ে দেবে ?'

হাসল আদম। বলল, 'বড়লোকের ঘোড়া ! আমিও অবশ্য বড়-লোকের চাকর !'

'আমিও যেমন বড়লোকের বউ !'

হাসল আদম। বলল, 'কিসে আর কিসে ! ঠিক আছে জিনিসপত্র-গুলো দেবেন, মুন্‌সীজীকে বলব পার্শেল করে পাঠিয়ে দিতে।'

'আচ্ছা, তুমি অনেক দিনই রাত্রের খাবার খাও না, খাবার পড়ে থাকে, রাঁধুনীটা নিয়ে গিয়ে ওর ছেলেমেয়েদের খাওয়ায়, কোথা থেকে কি খেয়ে ফেরো বলো তো ?'

'কিছু মনে করবেন না ম্যাডাম, আপনাদের খাবারে আমার ঠিক পেট ভরে না। আমি খাই ভুট্টা পোড়া, ভুট্টার জাউ, মোষের ঘি, ডালভাত, চাপাটি, তড়কা—কুলীদের বাসা থেকে খেয়ে আসি। ওদের হাঁড়ি থেকে আমি ভাত খেয়ে নিই। যাই ম্যাডাম, একটু টুব দিয়ে আসি।'

'এসো। দুপুরে একটার সময়ে ফিরবে। আমার সঙ্গে লাঞ্চ খাবে।'

'জী না। আপনার সঙ্গে এক টেবিলে বসে খাব না। স্ট্যাটাস

ম্যানার আছে। গরিব ঘর থেকে এসেছেন বলে গরিবদের দেখলেই প্রকাশ্যে চোখের জল ফেলবেন না, কর্তার মেজাজ অন্যরকম, আপনার ক্ষতি হবে। অবশ্য আপনাকে আমি দেবীর মতোই শ্রদ্ধা করি। আপনার গায়ে একটু আঁচড় লাগলে আমি সহ্য করতে পারব না। সাহেবও যদি অন্যায়ভাবে বেতাল কিছু করেন তো···কসুর মাফ করবেন, আচ্ছা, আমি আসছি।'

আদম অভিবাদন জানিয়ে ছুটে নেমে গেল। চোখের সামনে দিয়ে ঘোড়া বার করে নিয়ে বেরিয়ে গেল। যেন যৌবনের তুরন্ত প্রতিমূর্তি।

পতন-অভ্যুদয়

'প্রাইভেট বাসে মদ তুলতে দিচ্ছিল না কণ্ডাক্টররা, তাদের ওপরে মালিকের নির্দেশ, পুলিসী জুলুম হচ্ছে, সেজন্যে মদের চোরাই-চালানকারীরা দাঙ্গা বাধিয়ে দিতে গোটা লাইনের বাস বন্ধ হয়ে গেল। মাঝপথ, অন্ধকার। উদোম ঢা-ঢা বাতাস-খেলা করা বাদা অঞ্চল। হেঁটে বাড়ি ফিরতে গেলে আট মাইল। রাত তখন নটা। আমার ভাই বোন তুটি বাসপুঞ্জী থেকে উল্টাদিকে হাঁটতে লাগল। ভাইটি ঠিক করেছিল ঠাকুরপুকুরে পৌঁছে ডায়মণ্ডহারবার রোডের ছিয়াত্তর নম্বরের লাস্ট বাস ধরবে। আমতলায় পৌঁছে রিকশায় বা হেঁটে বাড়ি যাবে। ভাই বোন তুটি গিয়েছিল কলকাতায় বই কিনতে। বোনটি পড়ত একাদশ শ্রেণীতে, ভাইটি দ্বাদশে। তারা নবগ্রামের কাছাকাছি এসে হঠাৎ পাঁচ ছটি ছেলের দ্বারা আক্রান্ত হল। ভাইটি মারামারি চেঁচামেচি করতে গেলে তাকে ছুরি মেরে মুখ বেঁধে পুলের নিচে ফেলে দেওয়া হয়। বোনটিকে টেনে নিয়ে গিয়ে নতুন কারখানা গড়ে উঠতে থাকা বাড়িটার মধ্যে অত্যাচার করে মেরে ফেলা হয়। আমরা খোঁজ নিতে নিতে তুদিন পরে এসব খবর জানতে পারি। পুলিস-থানা সবই করা হল। কিছুই কাজ হল না। যারা এসব করেছিল

তাদের কেউ নাম বলতে পারেনি বলে পুলিস কাউকে ধরেনি। ওখানটা এমন জায়গা যে বাস বাঁধলে মানুষের আতঙ্ক হয়। একদিন বাস বাঁধতে হঠাৎ লেডিস সিটের জানলা পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটি যুবতী মেয়ে চিৎকার করে কেঁদে উঠল। একটি হাত বাইরে থেকে উঠে এসে মেয়েটির শরীরের এক পাশ প্রচণ্ড জোরে চেপে ধরেছে। বাস-যাত্রীরা কেউ টুঁ শব্দটিও করল না। করলে ওরা টেনে নামিয়ে নিয়ে যাবে নাকি! তারপর মেরে মেরে সাবাড় করে দেবে।'

সামনে বঙ্গোপসাগরের বোতল-সবুজ জলের বিস্তার— সমুদ্রের পাতায় বসেছিল মেহ্‌দি ইমাম আর মন্‌জিদা খাতুন। মন্‌জিদা বলছিল কথাগুলো। তার সঙ্গে নতুন আলাপ সাগরমেলাতেই। ওর চাহনি চলন দেখে মনে হয়েছিল মেয়েটি বেশ সপ্রতিভ। ইমামের দিকে তাকিয়ে হাসল। ইমাম ভাবল বোধ হয় চেনে তাকে। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে আবার হাসল। ইশারা করে কাছে ডাকতে এলো সে। ইমাম শুধোল, 'চেনো আমাকে?'

'সঠিক চিনি না, তবে বাসে অনেকবার দেখেছি, আমাদের ঐদিকেরই লোক আপনি।'

'তো হাসছ কেন?'

'একলা পড়ে গেছি, একজন চেনা-জানা লোক চাই, মেলায় বহু রকমের লোক আছে—সঙ্গে এসেছিল আমার বন্ধু শেফালী কর্মকার— সে কোথায় হারিয়ে গেল…এত লোক. কোথায় খুঁজি বলুন!'

'এসো। কিছু খাবে তুমি?'

'সেদো ভাত খাবি?'

হাসল ইমাম।

পাঁউরুটি, সিদ্ধ ডিম আর চা খেতে খেতে আলাপ জমে গেল। মন্‌জিদা স্কুল ফাইনাল পর্যন্ত পড়েছিল, পাস করতে পারেনি। ভাই বোনের দুঃখে বাপ মারা গেলেন। বাপ মরার আরো একটা কারণ তাদের ভাগ চাষে দেওয়া পাঁচ বিঘে জমি লাল ঝাণ্ডা পুঁতে দখল করার সময় লাঠি নিয়ে তাড়া করার সময় প্রচণ্ড চোট খেয়ে যান।

ভয়ে কেউ এগোতে পারেনি। মাঠে পড়ে থাকার দু ঘণ্টা পরে পাড়ার ছেলেদের সাহায্যে হাসপাতালে যান সৈয়দ আনিসুজ্জামান। সাতদিন পরে হাসপাতাল থেকে তুলে দিল বটে কিন্তু শরীর সেই যে তাঁর ভেঙে গেল আর সারল না। নাক দিয়ে মাঝে মাঝে রক্ত ঝরত। মাথায় যন্ত্রণা হত। মাথার ওপরে নাকি চার-পাঁচ ঘা লাঠি পড়েছিল। বাপ মারা যাবার পর কবর হল। কাজকর্ম চুকে গেল। মা তখন সংসারের হাল ধরেছেন। বড় ভাই বলতে কেউ নেই। মন্‌জিদা রান্নার কাজ দেখত। অভাব আব দেনায় এক বছরেব মধ্যে তাদের সংসার দেউলিয়া হয়ে গেল। ঘরের টালিখোলা বেচে ফেলতে হল। বুড়ী দাদী আব আবো দুটো বোন আছে—তারা ছোট ছোট। সংসার চলে না।···

'তুমি তাহলে সৈয়দবাড়ির মেয়ে?'

'আর বলবেন না। আমরা আগে কখনো গোবরে হাত দিতাম না, থালা-বাসন মাজতাম না, কাপড় কাচতাম না—এখন সব কবি। টাকাই হল সব।'

'সব নয়, অনেকটা বলো।'

'না, আমি বলি সব। টাকাই হল ঈশ্বর।'

'তুমি বনেদী মুসলমান ঘরেব মেয়ে হয়ে এ কথা বলছ। আল্লার সঙ্গে কারো তুলনা কবতে নেই, জানো তো? এটা হল শেরক্। এ পাপের মাপ নেই।'

'দেখুন, আল্লায় বিশ্বাস আমার তেমন শক্ত ভিত্তির ওপরে দাঁড়িয়ে নেই। আমার সামনে এখন শুধু দুঃখ, দুর্দশা, অত্যাচার, অনাচারের ভয়। খেয়ে-পরে সুখে থাকলে না হয় বসে বসে চাদর মুড়ি দিয়ে নামাজ পড়তাম।···আমার পড়াশুনো বন্ধ করেছিল তো পাড়ার মসজিদের মৌলানা নামক একজন ফেরেস্তা। তার দলবলকে লেলিয়ে দিয়ে আমার পিছনে বদনাম ছড়াতে লাগল। তবে এটাও ঠিক যে বদরুল নামের একটি ছেলের সঙ্গে আমি লুকিয়ে বার দুই সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম। বাপ আমার পড়াশুনো বন্ধ করে দিলেন। মৌলানা মাদ্রাসায় সব ছেলেমেয়েদেবই পড়াতে চায়। আধুনিক

শিক্ষাবিরোধী।'

ইমাম বলল, 'আসলে কি জানো, ধনী বিত্তবান ঘরের কর্তাব্যক্তিরা যতই ধর্মপরায়ণ হোন, নামাজের পর মোনাজাদ বা প্রার্থনার সময় কেঁদে ভাসিয়ে দিন, কিন্তু নিজেদের মেরিটোরিয়াস ছেলেদের কিছুতেই মাদ্রাসায় পড়তে দিয়ে মৌলানা বানাবেন না—তাদের উচ্চ ডিগ্রীধারী করবেন। দৈবাৎ যদি কোন ছেলে পাস না করতে পারে তবে তাকে অগত্যা মরা মাদ্রাসায় ঠেলে দেন। আর এটা হিসেব করে দেখ, মৌলানারা শতকরা নব্বুইজনই প্রায় অনাথ বালক। অনাথ আশ্রমে বা দাতব্য মাদ্রাসা থেকে পাস করে এসেছেন। তারা শেষ পর্যন্ত হয় মসজিদের ইমাম, না হয় মাদ্রাসার ওস্তাদজী হয়ে থাকেন। তাঁদের দিন কেটেছে অনশন-ক্লিষ্টতায়। কাজেই তাঁরা মনখোলা মানুষ হবেন কি করে? এর জন্য কি ইসলাম দোষী, না ঐ ক্ষুদ্র দারিদ্র্যপীড়িত 'মৌলানা' নামক ব্যক্তিটি?'

'আর, আমার কোথাও বিয়ে দিতে দিলে না। বাপ চেষ্টা করতে করতে মারা গেলেন, মা তো অসহায়। যেখান থেকে দেখতে আসে, পছন্দ হয়, পাড়ার মৌলানাভক্ত ছেলেরা তাদের পিছু নিয়ে দূরে গিয়ে ভাংচি দিয়ে আসত। আমি নাকি খুব খারাপ মেয়ে, নষ্টচরিত্রা ইত্যাদি। কাজেই আমাকে পেটের দায়ে···আপনি তো ভদ্রলোক, আপনাকে বলা যায়, আমাকে কিছু সাহায্য করবেন? নিয়ে গেলে তবে ভাত হবে। মা, বুড়ী দাদী, বোন দুটো সবাই শুকিয়ে পড়ে আছে। বুড়ী দাদীটা খিদের জ্বালায় খুনখুন করে কাঁদে। মরেও না হাড়জ্বালানে বুড়ীটা।'

'কত চাই তোমার?'

'আপনি কত দিতে পারবেন তাই বলুন।' হেসে গলে পড়ে শুধোল মনজিদা।

'আমার কাছে এখন তো বেশি নেই। পঁচিশটা টাকা আছে মাত্র।'

'পাঁচ টাকা রেখে কুড়ি টাকা দিলে···অবশ্য তেমন দাবি আমি

অত্যন্ত অন্যায় ভাবেই করছি, কেননা পরিচয় আমাদের সামান্যই—তবে আপনি এখন আমার সারাদিনের গার্জেন।'

কুড়ি টাকাই দিয়ে দিলে ইমাম। দিলে যেন অবহেলার সঙ্গে, টাকার ওপরে কোনো রকম দয়ামায়া না দেখিয়েই।

নোট দুখানা কপালে ছুঁইয়ে ছোট্ট একটা ব্যাগ বার করে ব্লাউজের ভেতর গুঁজে রাখল মনজিদা। বলল, 'চলুন এবার আমরা একটু বেড়িয়ে বেড়াই। চরের পুবদিকটায় শরখড়ির জঙ্গল আছে। সরু নদীর পানি নামছে কুলকুল করে। সমুদ্রে যেখানটায় এসে পড়েছে ঐ পানির ওপরে দাঁড়ান, দেখবেন কেমন সুড়সুড় করে পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। ঐ যে জবাফুলের মতো পড়ে আছে চরের ওপরে—ওগুলো কাঁকড়া—কাছে গেলেই সুট সুট করে গর্তের মধ্যে ঢুকে যায়।'

'তুমি কতদিন এ পথে নেমেছ?'

'কোন্ পথে?'

'এই যে সাহায্য চাওয়া।'

ঝকঝকে সুন্দর দাঁতে হাসল মনজিদা। বলল, 'ওরে বাবা, হিসেব চাইছেন! কেউ কি বলে বেশিদিন আছি? আর খুব অল্পদিন বললেও আপনি বিশ্বাস করবেন কি?'

'প্রতিদিন তোমাদের কত টাকা লাগে?'

'গোটা কুড়ি।'

'তারপর দেনা আছে তো?'

'হাঁ।' মনজিদার ব্যস্ততা নেই এখন। বসার পর ইমামের হাতখানা নিয়েছে কোলের ওপরে। নরম ফর্সা সুন্দর হাত।

'কত দেনা আছে?'

'হাজার দুই। কেন, দেবেন নাকি? আচ্ছা আপনি রোজ তো কলকাতায় যান দেখি। চাকরি করেন, না?'

'না। ব্যবসা আছে।'

'ভাল চলে?'

'মোটামুটি।'

'কিসের ব্যবসা ?'

'একটা ওষুধের দোকান আর একটা জুতোর দোকান।'

'কোথায় দোকান দুটো ?'

'কলুটোলায়।'

'বাবা আছেন ?'

'আছেন।'

'ভাইরা ?'

'দুজন।'

'আপনি ?'

'বড়।'

'বিয়ে করেছেন ?'

'করেছিলাম একবার, বনিবনাও হল না। তালাক হয়ে গেছে।'

'আপনি তালাক দিয়েছিলেন ?'

'না, আদালত থেকে মেয়ের বাপ তালাক নিয়েছেন।'

'দেনমোহরের টাকা তাহলে আদায় দেননি ?'

'পাঠিয়ে দিয়েছি। না দিলেও পারতাম, কারণ আমি তালাক দিইনি। মেয়েটার অন্যত্র ভালবাসা ছিল। বাপ মা জোর করে বিয়ে দিয়েছিলেন। মেয়েটিকে আমি খুব আদর করেও পোষ মানাতে পারিনি। যে বাঘিনী একবার মানুষের রক্তের স্বাদ পায়, সে বোধ হয় আর কিছুতেই শান্তি পায় না।'

'ওসব বাজে কথা। প্রকৃত খারাপ হওয়া অত সোজা নয়। আমি তো হা-পিত্যেশ করে মরছি একটা সংসার পাবার জন্যে।'

'কেউ তোমাকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখায়নি ?'

'দেখায়নি আবার ? আমি কি তাদের কথায় বিশ্বাস করি ?'

'দেখ বে-লাইন হলেই চিনতে পারা যায়, তাদের লাবণ্য বা শ্রী হারিয়ে যায়, চোখের লজ্জা কমে যায়। সভ্যভব্য সামাজিক মেয়েরা যে ধরনের থাকে, তা আর থাকে না—যা তারা হারিয়ে ফেলে তার জন্য দুঃখ হয় না ?'

'হয় না আবার? আয়নার সামনে দাঁড়ালেই কান্না পায়। রোদে ঘুরে ঘুরে আমার কি ছিল আর কি হয়ে গেল!'

'এর পর কি হবে?'

'আল্লা জানে।'

'আল্লায় তো তোমার বিশ্বাস তেমন শক্ত নেই বলছিলে।'

'ওটা কথার কথা। ব্যথা-বেদনার সময় তাঁকে না ডেকে পারা যায় না।'

'তোমার শরীরের গঠন খুবই ভাল। নাক-চোখও সুন্দর। শুধু রঙটা যা একটু চাপা। এতেই আরো মনোরম দেখায়। আমরা সভ্য হলেও এখনো অসভ্য আছি। নইলে তোমার বোনটার জীবন যেত না। এবকম ভাবে ঘোরাফেরা করো না। আমাদের সমাজে পুরুষের এ ব্যাপারে তেমন দোষ নেই। বাইরে বাইরে কে কি করে এলো তা কে জানছে। না জানালেই হল। ঘোষণা করে জানালেই পাপ।'

'অভাবেই মানুষের স্বভাব খারাপ হয়ে যায়। কত মিথ্যে কথা বলি— পরে বিবেকের দংশনে মরি।'

'বিবেক যতক্ষণ দংশন করে ততক্ষণ তুমি মানুষ আছ, তারপর তা মরে গেলে পশু হয়ে যাবে।'

গালগল্প অনেক হল। মনজিদাকে বেশ ভাল লাগল ইমামের। একসঙ্গে ফিরলও তারা। কথা রইল একদিন পরেই আবার তারা মিলিত হবে। সাগরিকায় রাত কাটাবে।

কথা রাখল মনজিদা। তার জন্য অসুস্থ মাকে ফেলে রেখে আসতে হয়েছে। আর একটি ছেলেকে কথা দিয়েছিল কলকাতায় গিয়ে সিনেমা দেখবে বলে। সঙ্গ দিয়ে সিনেমা দেখাটা অনেক ভাল। ফষ্টিনষ্টি করেই কয়েক টাকা হাতে এসে যায়। মনজিদা খেলতে জানে। নিজে সহজে ডোবে না। তার জন্যে কষ্ট হয় বটে, কিন্তু ভবিষ্যতের দায় তো আছে?

কিন্তু হোটেলে রাত থাকাটার দায় সে নিতে যাচ্ছে কেন? ইমাম কি সত্যিই বড়লোকের ছেলে? অনেকেই তো মুখে রাজা!

ইমাম এলো মোটরবাইকে চড়ে। দামী প্যান্ট জুতো জামা।

আগের দিনের মতো ধুতি পাঞ্জাবি পরা বাবু চেহারার নয়।

মন্‌জিদাকে পিছনে বসিয়ে নিয়ে স্টার্ট দিয়েই মোটরবাইক ছোটাল চওড়া রাস্তায় খুব দ্রুতবেগে। মন্‌জিদা আঁকড়ে ধরে রইল ইমামকে। মুখ ঘষতে লাগল পিঠের ওপরে। ইমামকে তার ভাল লেগেছে। তাকে বোধ হয় ভালবেসে ফেলেছে। ইমামের মনেব খবরও সে পড়ে ফেলেছে।

ইমাম শুধোল, 'কাল কোথাও বেব হওনি?'

'না।'

'কেন?'

'ভাল্লাগে না।'

'আজ এলে যে?'

'জানি না।' আঁকড়ে ধরল মন্‌জিদা।

'আমি তোমার খোঁজখবর নিয়েছি।'

'কি শুনলে?'

'খুব খারাপ।'

'যেমন?'

'পট্টিপাট্টা মেরে টাকা খসাও। চেপে ধরলে নাকি থানা-পুলিসের ভয় দেখাও। হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিতে চাও।'

হি হি কবে হাসল মন্‌জিদা।

হোটেলে আসার পর দৈবাৎ একখানা ঘব পাওয়া গেল। মুখ হাত ধুয়ে নিচেব বারান্দায় বসে তারা চা খেলো। নদীর ধার থেকে বেড়িয়ে এলো। গলগল করে অনেক কথা বলল মনজিদা। দোকানে এসে একখানা শাড়ি আর চাদর কিনে দিলে ইমাম। প্রসাধনী জিনিসপত্রও কিনলে মনজিদা। যেন তার বউ এমনি ভাব। এক রাতের বউ তো বটেই। মালাও কিনলে একখানা। রাত্রে বদল করে নেবে।

হোটেলে ফিরে আহারাদির পর নতুন শাড়ি পরল মন্‌জিদা। প্রসাধন করল। ইমাম তাকে আদর করে কত কিছু বলল। মালাবদলও করল দুজনে।

কিন্তু আসল রসেই মন্‌জিদা বাধার সৃষ্টি করল।

'না, এসব আমি পারব না। মায়ের নিষেধ আছে। পরে ভুগতে হবে।'

'কিন্তু তুমি কি বলতে চাইছ, এ ব্যাপারে তুমি নিজেকে খাঁটি রাখতে পেরেছ?'

'হাঁ। যার শপথ করে বলতে বলবে তারই শপথ করতে পারি।'

'বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না।'

'করো না। কেউ করবেও না। বিশেষ করে এই হোটেলে রাত কাটানোর পর। কিন্তু আমার সত্য তো আমার কাছে।'

'তুমি জানো হোটেল-ভাড়া কত? তোমার পিছনে কত খরচা হল?'

'সবই কি ঐ একটি জিনিসের জন্যে?'

'ঠিক তাই।'

'তাহলে আর কি বলব! ভালবাসা বলে কি কিছু নেই?'

'তোমাকে ভালবাসব! তুমি তো একটা…'

'এবার রেগে গেছ। গালমন্দ করছ। আমিও তাহলে কবি। তুমি তবে ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে এ পথে এসেছ কেন? তোমার বাপকে যদি আমি জানিয়ে দিই? যদি আমাকে বাধ্য করো, আমিও বাধ্য হব অন্য কিছু করতে। পুলিসকে বলব যে আমাকে ভুলিয়ে ফুসলে এ পথে এনেছ। অতএব চুপচাপ; তুমি একদিকে ঘুমোও, আমি একদিকে ঘুমোই।'

রাগারাগি হয়ে গেছে। অতএব দুজনে দুদিকে পড়ে রইল কিছুক্ষণ।

মন্‌জিদা ভাবল, অনেক জায়গায় ধাপ্পা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। এখন তার অগ্নিপরীক্ষা। নিজেকে তাকে জয় করতেই হবে। নইলে ইমামকে হয়তো চিরকালের জন্য বাঁধতে পারবে না। যদিও সে বুঝতে পারছে না এর পরিণতি কি হবে। ইমাম ভাবছে। ভাবছে হয়তো, ও তো অনেকের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা করেছে। দেশটা তো ভারতবর্ষ। তার সামাজিক নিয়মে এটা অবৈধ, বিশেষ করে মুসলমান সমাজ।

সমাজের মৌলবীরা···

'মনজিদা ?'

'বলো।'

'আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।'

'ক্ষেপেছ ? আবার দুদিন পরেই তালাক দিয়ে দেবে।'

'না, দেবো না।'

'তাহলেও আমি বিয়ে করব না।'

'কেন ?'

'মা, দাদী, বোনেদের খাওয়াবে কে ?'

'তুমি কি চিরকাল খাওয়াবার কর্তা ?'

'সেই রকম তো এখন ব্যবস্থা।'

'কতকাল এ রকম চলবে ?'

'জানি না।'

আবার চুপচাপ দুজনে, সেন্টের গন্ধটা পাগল করে তুলেছে। ইমাম ভাবল একবার মরীয়া হয়ে উঠবে নাকি ? মনজিদার নিতম্বটা কি সুডৌল আর আকর্ষণীয়। বুকও খুব পরিপূর্ণ। হবে না আবার, যৌবন-চর্চায় যার সারাটা দিন যায় তার শরীরের নদী কানাকানি তো হবেই।

'মনজিদা !'

'বলো।'

'কিছু বলার নেই।'

'তাহলে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ো।'

'কোন কোটিপতি এসে তোমাকে উদ্ধার করবে ?'

'আমার আবার উদ্ধার !'

'এটা তোমার ভেক। তোমার ব্যবসা ছলনা।'

'তাতেও কি বুদ্ধি কম খরচ হয় ? কোন্ সময় ঘোড়ার রাশ টানতে হবে সে বিদ্যাও তো আয়ত্ত করতে হয়।'

'হায় সৈয়দবাড়ির মেয়ে, তুমি অর্ধেক পানিতে নেমে না ডুবেই স্নান সারো। তোমার অর্ধেক অন্ধকারে, অর্ধেক আলোতে।'

'সকাল হলে পালাতে পারলেই বাঁচি। মায়ের জ্বর দেখে এসেছি। শুধু তোমার ওপর মনের টান পড়েছিল বলেই আসা। দেখলাম তুমি আর পাঁচজন, মানে আমার বোন রিজিয়াকে অত্যাচার করে যারা মেরে ফেলেছিল তাদের সঙ্গে বেশি তফাৎ নয়।'

'দেখ তোমার মুখে এসব মানায় না।'

'সত্যি। মানানসই কথা সবই তোমাদের মুখে বসানো যায়। দেখ সংসারে কে সৎ কে অসৎ এটা বলা যায় না। পতিতালয় বলে একটা জায়গা আছে, সেখানে খারাপ মেয়েরা থাকে। পুরুষদের তেমন একটা বাঁধাধরা জায়গা নেই। তারা সমাজের মধ্যেই থাকে। তাদের চেনা যায় না।'

'আমরা তর্ক ঝগড়া করবার জন্যে কি হোটেলভাড়া দিতে এসেছি?'

'নিশ্চয়। জীবনকে যাচাই করার জন্যে এমনি একটা ভাল জায়গারই তো দরকার। তুমি দুশ্চরিত্র না হলে এত টাকা আমার মতো একটা মেয়ের জন্য ব্যয় কর!'

'তুমি উপন্যাস পড়ো।'

'ঐ পড়েই তো গোল্লায় গেছি, পাস করতে পারলাম না। টেস্টে অঙ্কে আমি পাঁচ নম্বর পাই। দিদিমণিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আমি তো একটাও অঙ্ক কষিনি, তবে পাঁচ নম্বর দিলেন কোত্থেকে? দিদিমণি বললেন, ফাজলামি করো না!'

'মৌলানার চক্রান্ত, ভাইবোনের মৃত্যু, বাবার মৃত্যু, সংসারের অভাব-দেনা, সবকিছু মিলে তোমাকে হতাশার দরিয়ায় ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে! তোমার কাছ থেকে ভাল কিছু আর আশা করা যায় না।'

'তাহলেই ভাব, দেশের মানুষদের দুঃখে দুর্দশায় রাখলে কি ফল ফলতে পারে। যেসব ছেলেরা আমার বোনকে ধর্ষণ করেছিল তারা হিন্দী সিনেমার কাছ থেকে উৎকট যৌনাকাঙ্ক্ষার রসদ পেয়েছিল—সরকার কি এসব কোত্থেকে হয় জানে না? তার মোটা ট্যাক্স মিললেই হল।'

একসময় এসব অভিনয় মনে করে ইমাম চেপে ধরল মনজিদাকে।

মনজিদা শৃঙ্গার রসে বাধা দেয় না কিন্তু আদিরসের বেলায় অপারগ হয়ে অনুনয়-বিনয় করে, শেষে পায়ে ধরে কান্নাকাটি জুড়ে দেয়।

ইমাম শান্ত হল।

সকাল হতে তারা বিষণ্ণ মনে হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে এলো। কেউ কেউ তাদের দেখে আকারে-ইঙ্গিতে হাসাহাসি করতে লাগল।

হু-হু হাওয়া ভেদ করে মোটরবাইক ছুটে চলেছে। মনজিদা ইমামের পিঠে গাল রেখে তাকে আঁকড়ে ধরে বোধ হয় পরবর্তী আকর্ষণ সৃষ্টি করতে চায়!

ইমাম বিরক্ত হয়। মনে হয় যেন তার পিঠের ওপরে একটা কাঁকড়াবিছে জড়িয়ে আছে। ছাড়িয়ে ফেলে দিতে পারলে বাঁচে।

ঠাকুরপুকুরে এসে মনজিদাকে নামিয়ে দিয়েই একবার হাত তুলে বিদায় নিয়ে দ্রুত বাইক চালিয়ে কলকাতায় চলে এলো মেহদি ইমাম।

কয়েকদিন ব্যবসায় তাকে সারাক্ষণই বসতে হল। বাবার হার্ট-অ্যাটাক হবার পর তিনি হাসপাতালে আছেন। এক ভাই বাংলাদেশে গেছে। মেজো ভাইয়ের সঙ্গে মতান্তর। সে থাকে জুতোর দোকানে। জুতোর দোকানটাই বড় আর বিক্রিও বেশি।

ওষুধের দোকানে একজন লোক রাখা দরকার। মহিলা সেলস্‌ম্যান রাখা এখন একটা ফ্যাসান হয়েছে। মনজিদাকে নিলে কেমন হয়? বাজি হলে প্রেসক্রিপশন বা ওষুধের নাম পড়াটা শিখিয়ে দেবে।

বাবা সুস্থ হয়ে আবার দোকানে বসলেন। কিন্তু তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, দুবার স্ট্রোক হবার পর আর বেশিদিন তিনি নেই। তাই ছোট ছেলে ফিরে আসার পর তিনজনকে নিয়ে একদিন বসলেন। বিষয়, সম্পত্তি, ঘরবাড়ি আর ব্যবসা তিন ভাইকে সমান ভাগে বখরা করে দিলেন। জুতোর দোকানের ডবল পুঁজি, তাই ছোট দুজনকে দিয়ে দিলেন। ওষুধের দোকান পেলে মেহদি ইমাম। মেডিকেল সার্টিফিকেট ছিল তার তিন বছরের। বাবাও ছিলেন কোয়াক ডাক্তার।

মাত্র তিনদিন পরেই আবার স্ট্রোক হল বাবার। হাসপাতালে অজ্ঞান অবস্থায় একদিন কাটার পর তিনি মারা গেলেন।

কয়েকদিন বেঘোরে কাটল যেন ইমামের। রাত্রে ফেরার গাড়িতে মন্‌জিদার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল একদিন।

মন্‌জিদাই বলল, 'কি খবর মশায়, আপনার তো আর সাক্ষাৎ মেলাই ভার।'

'আব্বা মারা গেলেন হঠাৎ।'

'তাই, নাকি! আমার দাদীও মারা গেলেন…'

'তোমার সঙ্গে বিশেষ কথা আছে…'

'আসুন না আমাদের বাড়িতে। গেলে মা খুব খুশি হবে। আগে আমি জানতাম না যে আপনারা আমাদের দূর-সম্পর্কের আত্মীয় হন। আপনার আব্বা নাকি আমার মায়ের মাসতুতো ভাই। আপনারও সৈয়দ!'

'তাই নাকি। হবেও বা। যাক গে, কাল যাব।'

'জানেন আমি একটা চাকরি পেয়েছি?'

'কি কাজ, কত মাইনে?'

'একটা ট্রাভেলিং কোম্পানীর টিকিট বিক্রির কাজ। তিনশো টাকা মাইনে।'

'তোমাকে আমি পাঁচশো টাকা দোব—আমার ওষুধের দোকানে কাজ করবে?'

'এক্ষুনি রাজি। কাল আসবেন কিন্তু। মা শুনে স্বর্গ হাতে পাবেন।'

আর কিছু কথা নেই। বাসে ভিড় হয়ে গেল। লেডিস সিট ছেড়ে দাঁড়াতে হল ইমামকে।

সকালে সত্যিই ইমাম মন্‌জিদাদের বাড়ি গেল খোঁজখবর নিয়ে। উলুর ছাওয়া দু-কামরার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘর। মাটির পাঁচিল পড়ে গেছে। নিমগাছে কাঁকরোল পেকে ঝুলছে।

মোটরবাইক দেখে পাড়ার মেলা ছেলেমেয়ে জুটেছে।

মনজিদা দাওয়াতে বসতে দিল ভাঙা একটা চেয়ার এনে। ওর মা এসে বলল, 'তোমার বাপ তো সৈয়দ মনসুর আলি? আমার খালাতো ভাই ছিল। তো বাবা মন্‌জিদার জন্যে একটা কিছু করো। দুটো

ছেলেমেয়ে হায়াল, মনজিদা বাইরে বের হয়, সদাই বুক টিপটিপ করে।'

'আমার ওষুধের দোকানে কাজ করুক। আর একটা শর্ত, কোনো খারাপ ছেলের সঙ্গে যাতায়াত বা মেলামেশা করতে পারবে না। অ্যাডভান্স আমি এক মাসের মাইনে দিয়ে যাচ্ছি, এ দিয়ে এক বস্তা চাল আর মোটা বাজারগুলো আনান। আমি ওকে আজই নিয়ে যাচ্ছি—দোকান দেখে আসুক।'

'খুব ভাল কাজ করলে বাবা, আমরা একেবারে ডুবে গেছি। আমাদের হাত ধরে তোল। আমাদের আর দেখার কেউ নেই।'

চা-বিস্কুট এনে দিল মনজিদা।

দুটো করে চারটে টাকা দিলে ইমাম মনজিদার ছোট বোন দুটিকে। বললে, 'যাও, সন্দেশ কিনে খাও।'

কিছুক্ষণ পরে ইমামের দেওয়া শাড়িখানা পরে ভব্যসভ্য হয়ে মোটরবাইকে চড়ে গ্রামের রক্ষণশীল ঈর্ষাকাতর সমাজের বুকের ওপব দিয়ে বেরিয়ে গেল মনজিদা।

মৌলানা সাহেবের চোখে পড়ল দৃশ্যটা। সমাজটা যে ব্যভিচারে ছেয়ে গেছে সেকথা জানিয়ে তিনি ঘন ঘন দাড়ি চুলকোতে লাগলেন। উঠতি বয়সের ছেলেরা তাঁকে আশ্বাস দিলে যে এরপর এমন দৃশ্য দেখলেই তারা মোটরবাইক থামিয়ে দুজনাকে খুব ঘাকতক দিয়ে দেবে।

মনজিদা শান্ত ভদ্র হয়ে গেল। রুচিকব পোশাক-পরিচ্ছদ। গম্ভীব মেজাজ। রিকশায় কবে যাতায়াত করে।

ইমামের ভাই দুজন চটল ওষুধের দোকানে মেয়েমানুষ রাখার জন্য। কিন্তু তারা মুখ ফুটে কিছু বলল না। বলল বাড়িতে মাকে। মা একদিন ইমামকে বললেন. 'হ্যাঁরে ইমাম, দোকানে মেয়েছেলে রাখলি কেন বাবা?'

'আমাদের দূর-সম্পর্কের আত্মীয়া মেয়ে। দুরবস্থায় পড়ে গেছে।'

'দুরবস্থায় তো অনেক মেয়েই আছে।'

'কোনো অসুবিধা নেই, আমি ওকে বিয়ে করব মনস্থির করেছি। একদিন আনব ওকে, দেখো।'

মা আর কিছু বললেন না।

এক বন্ধের দিন মন্‌জিদাকে বাড়িতে আনল ইমাম।

মন্‌জিদা দেখল, বাড়ি নয় ইমামদের, আধুনিক প্রাসাদ। তবে ছোট ছোট। অতি সুন্দর।

মন্‌জিদা ইমামের মায়ের মন গলিয়ে দিল শ্রদ্ধা দেখিয়ে ভক্তিভরে পায়ে 'বোছা' দিয়ে। মা তাকে পছন্দ করলেন।

বিয়ে হয়ে গেল মন্‌জিদার। বিয়ের পরও দোকানে বসতে লাগল। সে চৌকশ মেয়ে। পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশার ফলেই যে মন্‌জিদা চতুর হয়েছে সে কথা ভালই বোঝে ইমাম।

আর একটা কিছু ব্যবসার জন্যে ভাবছে সে যেখানে মন্‌জিদাকে বসাতে পারবে, একক ভাবে। সে টাকা চেয়েছিল, টাকা করে দেবে।

এক বছর পরে নিউ মার্কেটে একখানা দোকান নিয়ে সাজাল। ক্যাসেট, রেকর্ডপ্লেয়াব, স্টিরিও, গ্রামোফোন ডিস্ক বিক্রির অতি আধুনিক দোকান খুলে মন্‌জিদাকে বসিয়ে দিলে। আব দুটো মেয়ে কর্মী নিলে যারা অতি আধুনিকা—আঙুলের মাথায় হাঁটে আর জিবের ডগা দিয়ে পিয়ানোব টুং-টুং সুরেব মতন মার্কিনী ইংরেজি বলে।

গঙ্গাসাগরের মেলা বসেছে। গত বছরের মেলায় আসা হয়নি। এ বছর মোটর নিয়ে এসেছে ইমাম। সঙ্গে মন্‌জিদা। সমুদ্রের ঢেউ-আছড়ে-পড়া তীরে নেমে শরখড়ির জঙ্গলের দিকে হাঁটতে হাঁটতে মন্‌জিদা বলল, 'মনে পড়ে, এখানে বসে তোমার হাত কোলে টেনে নিয়েছিলাম।'

'মনে পড়ে। আচ্ছা, কতবার মনে হয়েছে সাগরিকায় তুমি যা করেছিলে তা অভিনয়।'

'না, অভিনয় নয়।' যেন চেঁচিয়ে উঠল মন্‌জিদা। 'কেন, কি ক্ষয়ক্ষতি তুমি আমার শরীরে দেখেছ? মন ভরাতে পারিনি তোমার?'

'কি জানো মন্‌জিদা, যে যাকে ভালবাসে তার কণামাত্র ক্ষয় সহ্য করতে পারে না। উই ওয়ান্ট বিউটিফুল বিউটি।'

'মানুষের বিউটি কতদিন থাকে? আর বেশিদিন না থাকাই মঙ্গল, কারণ তোমাদের মতো সন্দেহপরায়ণ স্বামীদের তাতে মানসিক বিশ্রামও জোটে।'

হাসল ইমাম।

পায়ের নিচে থেকে স্রোতের টানে হুড়হুড় করে বালিমাটি সরে যাওয়া জায়গাটাতে দাঁড়িয়ে থেকে খুশী হয়ে মন্‌জিদা বলল, 'তোমাকে যতটা ছোটলোক ভেবেছিলাম আমার কাছে তুমি তত ছোটলোক নও কারণ তোমার মতো ধনবানের পুত্রের মধ্যে অহংকারের চাইতে মানব-কল্যাণের চিন্তা বেশি ছিল, নইলে এই অধম নারীটি আজ তোমার সন্তানের মায়ের মর্যাদা পেত?'

'আমার আগের বউটা, বেচারা! সে ভেসে গেছে। যার প্রেমে পড়ে সে সোনার-সংসার ছেড়ে গেল, আজ নাকি সে কোথায় পালিয়ে গেছে আর একটা মেয়েকে নিয়ে। বেচারা বড় দুঃখে পড়ে আছে। ভুল করে এমন জায়গায় গিয়ে পড়ল যেখান থেকে আর ফিরিয়ে আনা যায় না।'

ইমামের কণ্ঠস্বরে বাষ্প। চোখ দুটো সজল।

সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ছে আর টেনে সমুদ্রগর্ভে নেমে যাচ্ছে, আবার উঠে আসছে, আবার নেমে যাচ্ছে—এ খেলা তার অনন্তকালের। এর শেষ নেই সমাপ্তি নেই।

গর্ভের মধ্যে সন্তানের নড়াচড়া অনুভব করে মন্‌জিদা, আর কিছু নয়। সমুদ্র মহৎ হতে বলে। পুরনো পাপ আর দুশ্চিন্তা ভুলে যেতে বলে। চিরচঞ্চল হাস্যমুখর। তাই তো এখানে ছুটে আসা।

অন্ধকার নদী! জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। মাঝি আর দাঁড়ী চারজন ঘুমিয়ে পড়েছিল। একসপ্তা ধরে মেদিনীপুর থেকে পঞ্চাশ কাহন খড় এনে চব্বিশ পরগণার আঁচিপুর ইট আর টালিখোলার কারখানায় উজাড় করে ক্লান্ত অবসন্ন মাঝি মাল্লারা নঙ্গর ফেলে পড়ে ছিল।

হঠাৎ কয়েকজন লোক উঠে এলো নৌকোয়। হাতে তাদের অস্ত্রপাতি।

'এই উঠে বস্ বেটারা, নৌকো চালা।'

মাঝি জান আলি বলল, 'তোর বাবার নৌকো?'

'কেন রক্তপাত ঘটাবি বাবা, চল্ যা বলছি শোন্।' সর্দার গোছের লোকটি বলল। তারার আলোয় তার উদোম বুকের লকেটটা চকচক করছে। বোতাম খোলা টি শার্ট গায়ে উড়ছে। মাথায় ঝাঁপি চুল। পরনে ফুলপ্যাণ্ট।

দশ বারোজন লোক চেপে বসে গেছে তখন।

'নৌকোটা বড় আছে রে।'

'ঢাল্, একটু গড়া, গলা ভিজিয়ে লিই।'

জান আলি বলল, 'কোথা যাবে তোমরা? কি উদ্দেশ্য?'

'যাব শ্বশুরবাড়ি। উদ্দেশ্য প্রেম-প্রণয়!'

সকলে হেসে উঠল।

'এত রাতে প্রেম-প্রণয় ছাড়া কোন্ উদ্দেশ্যেই বা এতগুলো জোওয়ান মানুষ বেরুব বাবা!'

'বাবার নৌকোই বটে! চলো বাবা।'

'বলো হরি—'

'হরি বল হরি।'

'মরা পুড়িয়ে ফিরছি আমরা।'

মাঝি মাল্লারা গতিক মন্দ দেখে নৌকোর দাঁড় আর হাল ধরল। ঝপাৎ ঝপাৎ। দাঁড় পড়ছে উঠছে! জান আলির দাড়ি হাওয়ায় উড়ছে। বুঝতেই পারছে এরা ডাকাত দল। তার কাছে খড় বেচা আড়াই হাজার টাকা আছে। নানান জায়গা থেকে বিশ টাকায় কেনা খড় পঞ্চাশ টাকা কাহনে বেচেছে। এদের সঙ্গে লেগে টাকা আর জান খোয়াবে নাকি?'

জল-পুলিসের হাতে পড়লে ডাকাত দলের সঙ্গে তারাও আটকা পড়ে যাবে।

তবু নরম স্বরে বলল, 'কোথা যেতে হবে বাবারা?'

'হীরাপুর!'

আর কোন কথা নেই। অন্ধকার নদী কেবল ঢেউ ভেঙে আড়মোড়া খাচ্ছে। মাঝে মাঝে বয়ার লাল আলোটা জ্বলে উঠছে। ওদিক জুটমিলের আলোয় নদীর খানিকটা অংশ ঝলমল করছে। ওরা সবাই চাপাস্বরে কথা বলছে।

ওপার থেকে পুলিস-লঞ্চের সার্চ লাইট পড়ল নদীতে। ওরা শ্মশান-যাত্রীদের মতো হরিধ্বনি দিতে লাগল ঘনঘন।

ঘণ্টাখানেক উজান বেয়ে আসার পর হীরাপুরের চড়ায় নৌকা বাঁধল জান আলি। ওরা সবাই লাফ দিয়ে নেমে গেল।

সরদার বলল, 'হাজার টাকা দোব। নৌকো নিয়ে এখানে থাকবে তোমরা।'

জান আলি বলল, 'জী হুজুর। আমরা এখানে বসে রইলাম। আল্লা তোমাদের আশা পূরণ করুক।'

ওরা সকলে চলে গেল।

দাড়ী চারজন ছুটে এলো জান আলির কাছে।

'চলো চাচা এবার পালাই মোরা।'

'কিন্তু কোথা যাচ্ছে ওরা, কি করবে, জানব না? হাজার টাকা যদি পাই মোরা?'

'আর যদি ধরা পড়ি—ওরা তো ডাকাত দল। ডাকাতি করতে বেরিয়েছে।'

জান আলি বলে, 'ডাকাতি করবে তাদের যাদের অনেক মালমাত্তা আছে। গরিবের ধন সেঁতেছে। লুটুক না।'

অগত্যা অপেক্ষা করতে হয়।

নদীর জলের শব্দ। ঢেউ ভাঙছে। ঢেউ উঠছে। আকাশে চাঁদ নেই কেবল অসংখ্য তারার ঝিলিমিলি।

আবার হরিধ্বনি। ওরা চরের ওপরে উঠেছে। এবার গ্রামের মধ্যে নামবে।

ভয় করছিল জান আলিরও। তবু চুপ করে রইল।

কিছুক্ষণ পরেই চিৎকার, হল্লা, বোমা ফাটার আওয়াজ।

ভয় পেয়ে দাঁড়ীরা দাঁড় টেনে মাঝ দরিয়ার দিকে চলে আসতে লাগল। জান আলিও ভয় পেয়েছে। ওবা এসে ডাকলে তখন দেখা যাবে।

আরো আধঘণ্টার পর সবাই ওদের ছুটে এলো।

'মাঝি, ছুটে এসো।'

'এই মাঝি—'

'ধর্মের বাপ আমার—চলে এসো। অনেক টাকা পাবে।'

জান আলি বলল, 'চলো যাই।'

দাঁড়ীরা বলল, 'না, যাব না, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।'

কিন্তু জান আলি সাত-পাঁচ ভাবল। ওদের পেছনে কেউ ধাওয়া করছে না। গ্রামের মধ্যে হল্লা হচ্ছে। আলো ছুটোছুটি করছে। বাঁধের ওপরে লোক আসছে বোধহয়।

অন্ধকার নদীর তলা।

নৌকো ভেড়াতে চেষ্টা করল মাঝি। চরের কাছাকাছি পৌঁছতে না পৌঁছতেই ওরা সবাই লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে পড়ল। একটা লোককে ধড়াস করে ফেলে দিল। মুখ বাঁধা। হাত-পা বাঁধা। লোকটি গোঁঙাচ্ছে। আরো তিনজন এলো। সঙ্গে একটি মেয়ে। বলছে, 'বাবারা

আমাকে ছেড়ে দাও।'

সবাই যখন নৌকোয় উঠেছে বাঁধের ওপার থেকে প্রচণ্ড এক জনস্রোত নেমে এলো। টর্চের আলো পড়ছে। ওদের হাতে লাঠি বল্লম শড়কি তলোয়ার।

সরদার বলল, 'তাড়াতাড়ি মাঝ দরিয়ায় ছুটে চলো মাঝি।'

নৌকো চর ছেড়ে জলে ভেসে এলো।

'এ লোকটা কে সবদার?'

'সমাজের কলঙ্ক।'

'আর মেয়েটা?'

'পাপীয়সী।'

'তোমরা তাহলে ডাকাত দল নয়?'

'না। আমরা পার্টির লোক।'

'বলো হরি, হরি বল হবি।'

একদিন পরে খবরের কাগজে সংবাদ বের হল: বিখ্যাত নেতা ও ব্যবসায়ী আলো রায় ও তাঁর কন্যা উর্মিমালা দেশের বাড়ি থেকে অপহৃত।

আলো রায় আমেরিকার কালিফোর্ণিয়ার ব্যবসায়ী। দেশেও অনেক ব্যবসা আছে। কন্যা উর্মিমালা অবাধ যৌনতা ভোগের লীলা-কলা শিক্ষার স্কুল খুলে প্রচুর টাকা পয়সা কামিয়েছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ সে নাকি সুন্দরী শিক্ষিতা নারীদের চাকরি দেবার লোভ দেখিয়ে এদেশ থেকে নিয়ে গেছে। তার ও তার এই ব্যবসার গুরুদেব।

আলো রায় বিখ্যাত একটি সাম্প্রদায়িক দলের নেতা বিশেষ।

পুলিস তন্ন তন্ন করে খোঁজ করছে—আলো রায় আর উর্মিমালার কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

যে সন্ধান দেবে তাকে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

কয়লা খাদের গভীর এক আস্তানায় আলো রায় পড়েছিলেন।

মেয়ে উর্মিমালাও।

আলো রায় বললেন, 'ভাবতে পারিস উর্মি, আমি একশো কোটি টাকার মালিক।'

উর্মি বলল, 'পিপাসায় আমার প্রাণ যায়।'

'আমরা এখানে মারা যাব। কেউ জানবে না। দেশের বাড়ি থেকে এমন হবে কে জানত? অসহ্য যন্ত্রণা। চোখ দুটো আমার অন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।'

উর্মি বলল, 'আমারও।'

'লোকগুলো টাকা চাইল না। যত টাকা চাইত দিতাম।'

'এরা আদর্শবাদী।'

একজন কে যেন এলো। পায়ের শব্দ। কাছে এসে দাঁড়াল লোকটা। চুক চুক করে আফসোস করল। বলল, 'একি দুর্দশা! সমাজের আলোকস্তম্ভ আলো রায়!'

'কে আপনি?'

'গগন সাঁফুই।'

'আমাদের বাঁচাও। প্রাণে বাঁচালে বিশ লাখ টাকা দোব।'

'যদি সত্যি কথা বলেন মুক্তি হতে পারে।'

'সব বলব, আমাকে বাঁচান, আপনার পায়ে ধরি।'

'বড় বড় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাগুলো কি আপনি ঘটাতেন?'

'হ্যাঁ। টাকা দিতাম। এক লাখ টাকা খরচা করলে একটা বড় রকমের দাঙ্গা বাধানো যায়।'

'কিন্তু কেন, কিসের স্বার্থে তা করতেন?'

'দেশে বিশৃঙ্খলা বাধাবার জন্যে। বিদেশী মন্ত্রণায়।'

'থানা পুলিস সংবাদ-পত্র সবই তো আপনার বশীভূত—তাহলে এমন হল কেন?'

'যারা করেছে আমি মনে করেছিলাম তারা ডাকাত দল। টাকা, সোনা লুটেই চলে যাবে। কিন্তু তারা তা নিল না।'

'দেখলেন তো, 'টাকা পয়সাই সব নয়। আদর্শের লড়াইয়ের কিছু

কিছু লোক এখনো আছে যারা আপস করে না। এখানেই আপনারা মরে যান। একবিন্দু জল পাবেন না। আমাদের পার্টির অনেক লোককে আপনি মেরে ফেলেছেন। আপনার মেয়ে বহু গরিব অনাথ মেয়ের সর্বনাশ করেছে। পার্টির নির্দেশ নেই আপনাদের প্রাণে বাঁচানোর।'

'সব টাকা আপনাদের পার্টিকে দিয়ে দেব।'

'তার দরকার নেই। চললাম আমি।'

'পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল।'

'কে মা এই গগন সাঁফুই ?'

'জমিদার জোতদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করা এক চাষী। ওর মেয়ে রত্না সাঁফুই, আমি কিডন্যাপ করে নিয়ে গিয়েছিলাম। হার্টের চিকিৎসার নাম করে।'

'আমি হাত খুলে ফেলেছি মা। পাও খুললাম। দেখি তোর বাঁধনও খুলে দিই। আমরা হাতড়ে হাতড়ে যদি পালাতে পারি।'

আলো যায় আর উর্মিমালা অনেক চেষ্টা করে বুকে হাতে পায়ে আঁচড়ে হামাগুড়ি দিয়ে গড়ের খাদ বেয়ে বেয়ে ওপরে উঠলেন।

তারপর বাপ-বেটিতে জড়াজড়ি করে হাঁটতে গিয়ে ধস নেমে তাঁরা তলিয়ে গেলেন অতল গহ্বরে।

শব্দ পর্যন্ত পাওয়া গেল না।

রাত্রে গগন সাঁফুই তাঁদের খোঁজ নিতে এসে যখন দেখল নেই তখন সে ভয় পেল। ভাবল পুলিস তাদের খুঁজে পেয়েছে। তাহলে এবার সে ধরা পড়বে?

টর্চের আলো ফেলে দ্রুত সে নেমে এসে মাঠের পথ ভেঙে ছুটতে লাগল। কাঁটা খোঁচা কিছুই এখন তার জ্ঞান নেই।

বাড়ি এসে গগন একঘটি জল খেল।

ভাবতে লাগল চোখে গুনস্ুঁচ ফুটিয়ে অন্ধ-করা বাপ-বেটিতে ওরা গেল কোথায়? হাত-পা খুলে উঠে পালিয়ে গেছে? তাহলে তো বিপদ। গগন সাঁফুই নাম বলেছে ওদের সামনে।

গগন অস্থির। থানার লোকরা কোনো রকম খোঁজ পেয়েছে কিনা

আন্দাজ করতে বেরুল। গগনের শ্বশুরবাড়ি কয়লাকুঠির দেশে বউ আগেই এসেছিল। চালের লরির ভেতরে মুখচোখ বাঁধা ছিল আলো রায় আর উর্মিমালার। কোথায় হুগলী নদীর চর আর কোথায় কয়লা-কুঠি। লরি চলে গেছে।

সপ্তাখানেক উদ্বেগের মধ্যে কাটল গগন সাঁফুই আর তার বউয়ের।

কলকাতার পার্টি অফিসে হাজির হল গগন। তার এখন দারুণ সম্মান। সার্থক অপারেশন।

পার্টির সেক্রেটারি বললেন, 'তৈরী হও গগন, সামনের বারে তুমি তোমার এলাকা থেকে এম. এল. এ. হচ্ছ।'

ঠ্যাং লম্বা করে ইজিচেয়ারে পড়ে চুরুট টানতে লাগল গগন সাঁপুই। ধোঁয়ার মধ্যে অনেক হিজিবিজি। মেয়ে না হারালে ডাকাত হবার আক্রোশ কি সে ধরতে পারত?

গগন এখন স্পষ্ট বুঝতে পারল হাত-পা খুলে আলো রায় আর উর্মিমালা জড়াজড়ি করে হেঁটে চলে পালাবার সময় কোনো ঝুলন্ত চাঙড়ের খসে পড়ার মধ্যে নিজেরাও পড়ে গেছে অতল গহ্বরে!

হঠাৎ হা হা করে হেসে উঠল গগন। পার্টি অফিসের সবাই ছুটে এলেন।

'কি হল, কি হল গগন?'

গগন বলল, 'না, কিছু না।'

হুর

সন্ধ্যার মুখে ভয়ঙ্কর মেঘ গোটা পশ্চিমাকাশ ছেয়ে ফেলেছে। বেশ অনেকক্ষণ দেরি করে লোকাল বাসটা এলো একেবারে ঠাসাঠাসি যাত্রী নিয়ে। বেশির ভাগই চট কলের, তেল কলের লোক। গায়ে তেল, ঘাম আর ফেঁসোর গন্ধ। ওরা সব সময় বিরক্ত। মালিক-ম্যানেজারকে গালিগালাজ করে এসেছে কারখানায়, এখন বাসের

চালক-পরিচালকদের মা-মাসীর সতীত্ব হরণ করবার কথা দিচ্ছে।

মেহ্‌দি ইমাম কোনোক্রমে ঝুলতে ঝুলতে শেষ পর্যন্ত বাসের ভেতরে ঢুকতে পারল ; একটা লোক কনুইয়ের গুঁতো মারল, মাথা চেপে ধরল, একটু জায়গা ছাড়তে নারাজ। তবু মেহ্‌দি ইমামের ব্যায়াম করা তাগড়াই শরীরকে তারা বাগে আনতে পারল না। চকচকে পোশাক আর চেহারা দেখে বিড়বিড় করল, 'শালা বড়-লোকের বাচ্চা!'

ঝড় উঠল। বাস ছুটে চলেছে গ্রাম জনপদের ভেতর দিয়ে। ধুলো আর ঝরা পাতা ঝড়ের বেগে ছুটতে লাগল। বাসের জানলা অনেকে বন্ধ করে দিতে চাইল। কেউ কেউ বারণ করল। ঝড়ের বেগ প্রচণ্ড।

মেহ্‌দি ইমামের চোখ পড়ল মহিলা সিটের ওপরে অসমান্য সুন্দরী এক মেয়ে। সবাই তাকে দেখছে। তার সামনে একজন বুড়ো লোক। মেহ্‌দি রাঙানো দাড়ি। ফরসা চেহারা। কপালে নামাজ পড়ার দাগ। ইনিই ওর কেউ হবেন, তবে বাপ নিশ্চয়ই নন। কেননা বুড়োর বয়স ষাট পেরিয়ে গেছে।

একজন বলল, 'মেয়েটা ভেস্তের হুর!'

আর একজন বলল, 'এত রূপসী মেয়ে কক্ষনো হতে পারে?'

'হয়েছে তো শালা! ঐ বুড়ো নামাজ পড়ে পড়ে তৈরি করেছে।'

'তোর মাথা! আরে বাপ, ঝড়ে কি গাড়ি উল্টে দেবে নাকি!'

অন্ধকার নেমে গেছে তখন। বিদ্যুতের তলোয়ার আকাশখানাকে যেন ফেড়ে চৌচির করে দিচ্ছে। বাজ পড়ল কোথাও মেদিনী কাঁপিয়ে। মেয়েটি ভয়ার্ত চোখে বুড়ো মানুষটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'না না আমার বড্ড ভয় লাগছে!'

'আল্লাকে ডাকো।' তিনি মেয়েটির হাত ধরলেন।

গাছপালা ভেঙে পড়তে লাগল। বৃষ্টিও নেমে গেছে মুষলধারে। বাস বন্ধ হয়ে গেল। পথের পাশের টিনের ঘরের চালটা হঠাৎ দম্‌কা ঝড়ে উড়ে গিয়ে পড়ল অনেকটা দূরে। ঘর-বাড়ি ভেঙে পড়ছে। ঝড়ের ওজন যেন লক্ষ লক্ষ টন। আবার একটা দম্‌কা বেগ এলো। আর

আস্তে আস্তে চলতে থাকা বাসটা অকস্মাৎ উল্টে গেল যেন একটা পাল্কীর মতন। চিৎকার চেঁচামেচি। ঝড়ের তাণ্ডব। কারো কারো মন বোধহয় বলেছিল এমনি একটা বিপদ ঘটুক আর সুন্দরী মেয়েটাকে আমরা ছিঁড়ে খাই···তাতে যদি মৃত্যুও ঘটে ঘটুক···অথচ মৃত্যুর স্বাদ যে কি জিনিস তারা তা জানত না, আর হঠাৎ যখন তা নেমে এলো, প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে একে অপরকে মাড়াতে কামড়াতে আঁচড়াতে লাগল অন্ধকারে।

মেহ্‌দি ইমাম, আল্লাকে মালুম, কেমন করে সে বাইরে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল! বাসটা উল্টে ছিল ডানদিকে। দোরটা উপরে। হঠাৎ নারীকণ্ঠের আর্তনাদ শুনে সে প্রচণ্ড জোরে টান দিয়ে ঘুঁষি মেরে দোরের লোকগুলোকে ফাঁকা করে ফেলে আবার ভেতরে ঢুকল। আর একটা লোকের তলা থেকে মেয়েটিকে টেনে তুলে বার করে আনল। ঝমঝম করে বৃষ্টি হচ্ছে। বিদ্যুৎ চমকাতে মেয়েটিকে দেখতে পেল। সে বলল, 'আমার নানা! বুড়ো মানুষ—ওগো দেখ না···'

কার যেন কাঁধে পা দিয়ে প্রথমবারে বেরিয়ে আসার সময় সেই লোকটা পায়ে কামড়ে দিয়েছিল। কেটে গিয়ে রক্ত বার হচ্ছে। জ্বালা করছে। হাতেও লেগেছে খুব জোর। ভাঙা কাঁচে কপাল কেটে গেছে। তবু তার মনে হল নানাজী লোকটিকে বাঁচানো দরকার। তবে বাইরের যদি অন্ধকার আর বৃষ্টির মধ্যে এই অসামান্য রূপবতীটির ওপর কেউ ঝাঁপিয়ে পড়ে তার অসহায়তার সুযোগ নিয়ে? এক নিমিষ ভাবার পর তা মন ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মেহ্‌দি ইমাম আবার গাড়ির মধ্যে ঢুকল। লোকজন তখনো মারামারি ঠেলাঠেলি হুস্তোহুস্তি ঘুষোঘুষি করতে ব্যস্ত। গাড়ির মুখটা ডানপাশে গোঁৎ খেয়ে খালের পাঁকে আর একহাঁটু পানির মধ্যে ডুবে গেছে। ড্রাইভারকে নাকি বার করা যাচ্ছে না, সে মারা গেছে। কণ্ডাকটর দুজন অন্যদিক দিয়ে ঢুকে তার ঠ্যাং ধরে টানাটানি করছে।

ঝড়ের শব্দে কাছের পল্লীর মানুষরা বাসের লোকদের চিৎকার চেঁচামেচি শুনতে পায়নি—নইলে পঙ্গপালের মতো ছুটে আসত মানুষ,

জনকে উদ্ধার করতে অথবা লুটপাট করতে। বনগ্রামে একবার গাড়ি ওল্টাতে সেখানের লোকরা কার তেলের টিন, কার ব্যাগ, কার গহনা ছিনতাই করল তার ঠিক নেই। দত্তদের বাড়ির একটা বউ যখন উদ্ধার করা হয়েছিল তার গায়ে বিশ ভরি সোনার এক রত্তিও কিছু ছিল না —উপরন্তু সে ছিল সম্পূর্ণ বিবস্ত্র। মেয়েরা এসে তার লজ্জা ঢেকে দেবার পর তারা জানতে পারে যে সে ওরই মধ্যে ধর্ষিতাও হয়ে গেছে। মেহ্‌দি ইমামের মধ্যে এসব ভাবনা চকিতের মধ্যে খেলে গেল। বুড়ো মানুষটিকে সে খুঁজে পেল। টেনে পিঠে তুলে নিয়ে নামল। মেয়েটি ছুটে এসে দাদুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল।

হঠাৎ আবার দম্‌কা ঝড় এলো!

পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারছেন না বৃদ্ধ, তার ওপর ঝড়ে তাঁদের ঘাড়ধাক্কা মেরে ছোটাতে ছোটাতে হঠাৎ শূন্যে তুলে নিয়ে গিয়ে আছাড় মারল। তিনজনে তিন জায়গায়। বিদ্যুৎ চমকাতে তাঁরা পরস্পরকে দেখতে পেলেন। বাসের আর সব লোকেরা কে কোথায় পালিয়ে গেছে। একপাশে শূন্য মাঠ। অন্যদিকে খালের ওপারে বাঁশবন, পল্লী আর মাঠঘাট।

বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'মাটিতে শুয়ে পড় বেলা।'

মেহ্‌দি আগে বৃদ্ধের কাছে গেল। ঝড়ে ঠেলে নিয়ে চলে যাচ্ছে। বাতাস কাটিয়ে হুম্‌ড়ি খেয়ে বৃদ্ধের কাছে আসতে তিনি তাকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে উঠে বললেন, 'তুমি যেই হও দাদুভাই, আমার নাতনিটিকে দেখ—হে আল্লা, ঝড়বৃষ্টি থামাও ··'

মেহ্‌দি ইমাম বেলার কাছে গিয়ে যেই তাকে পাঁজাকোলা করে বুকের ওপর তুলল অমনি সমস্ত পৃথিবী আলো করে দিয়ে ভয়ঙ্কর জোরে বাজ পড়ল কাছের তালগাছটার মাথায়। ভেড়ির কোলে দুজনেই উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল।

বেলা কাঁদছে।

'ভয় কোরো না, আল্লাকে ডাকো। আল্লা, আমাদের এই বিপদ থেকে রক্ষা করো!'

বৃদ্ধের মুখে আল্লার জেকের চলতে থাকলেও মনে একটা শঙ্কা জেগে উঠেছিল বাইশ বছরের যুবতী নাতনিটির ওপরে অপরিচিত যুবকের দ্বারা দৈহিক অত্যাচার ঘটে যাবার, কেন না মানুষ পশু ছাড়া আর কিছু নয় আর সংসারে দেখা যায় যে হয় রক্ষক সে হয় ভক্ষক।

কিন্তু পা দুটোয় আদৌ ভর দিতে পারছেন না বৃদ্ধ। হামা টেনে টেনে তিনি এগুচ্ছিলেন। জামা-কাপড় সব ছিঁড়ে গেছে। শীতে কাঁপছেন এই গ্রীষ্মকালেও। বিদ্যুৎ চমকালে কলেমা পড়তে পড়তে লক্ষ্য রেখেছেন ওদের ওপরে। পাশাপাশি ওরা পড়ে আছে। ছেলেটি সম্ভ্রান্ত ঘরের। চেহারা দেখলেই তা বোঝা যায়। বড় দয়ালু, তাঁদের বাসের মধ্যে উদ্ধার না করলে হয়তো মারাই যেত।

ঝড়ের বেগ কিছুটা কমলেও বৃষ্টির তেজ আরো বেড়ে উঠল। বজ্রপাত আর হচ্ছে না। আধ ঘণ্টার মধ্যে যেন লণ্ডভণ্ড কাণ্ড হয়ে গেছে। কত লোকের ঘরবাড়ি পড়ে গেছে। ঝড়বৃষ্টি থামলেও যানবাহন আর চলবে না—গাছ পড়ে পথ বন্ধ।

ওরা তিনজনে এক জায়গায় হলে বৃদ্ধ হাত ধরে কৃতজ্ঞতা জানালেন, 'ভাই, তুমি আমাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করেছ, অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে।'

'আল্লাই একমাত্র উদ্ধারকারী, আমি তাঁর আজ্ঞাবহ দাসানুদাস। কৃতজ্ঞতা তাঁকেই জানান এই জন্য যে এখনো প্রাণে বেঁচে আছেন। আপনারা যাবেন কতদূর ?'

'ভাই তুমি মুসলমান, শোকর আল্‌হামদো লিল্লাহ্, আমাদের বাড়ি সেই মহম্মদপুরে, একটা বাস ছেড়ে আর একটা বাস ধরতে হবে, আটে ছয়ে চোদ্দ মাইল দূরে। তোমাদের বাড়ি কোথায় ?'

'বাড়ি মাইল চারেক দূরে, সেখানে তো এখন যাওয়া যাবে না, রিকশাও মিলবে না, তার চাইতে আসুন আমার নার্শারীতে যাই—এই মাঠটা পার হয়ে গেলেই পৌঁছে যাব।'

'তাই চলো, কিন্তু আমি তো হাঁটতে পারছি না, দুটো হাঁটুর খিলই জখম হয়ে গেছে। কত লোক গায়ে পড়ল আমার। দম ফেটে মরে

যাচ্ছিলাম। কি নাম ভাই তোমার ?'

নাম বলেই মেহ্‌দি ইমাম বসে পড়ে বৃদ্ধকে বললে, 'আপনি আমার পিঠে উঠুন ; বেলা, তুমি চলো আমার সঙ্গে, লজ্জা করার কিছু নেই, আপনি যদি আমার দাদু বা বাপ হতেন, আমাকে তো সেই-ভাবেই কাজ করতে হত।'

মেহ্‌দি ইমাম বৃদ্ধকে পিঠে তুলে নিয়ে মাঠের ওপর দিয়ে মিলিটারী কায়দায় হাঁটতে লাগল।

আনন্দে কাঁদতে লাগল বেলা। হাঁটতে লাগল পাশে পাশে। পায়ের জুতো তাঁর কোথায় পড়ে গেছে। দাদুর পাও খালি। কেবল মেহ্‌দি ইমামের পায়ে মজবুত জুতো, পরনে প্যান্ট আর বুশ সার্ট। মাথার চুল ভিজে ঘাড়ে মুখে নেমে এসেছে।

বৃদ্ধ বলতে লাগলেন, 'অসহায় মানুষের ওপরে দয়া করলে আল্লা তার সহায় হন···আমার নাম ইসমাইল গাজি। এন্‌ট্রেন্‌স পাস করে প্রাইমারী স্কুলে মাস্টারী করতাম। তারপর সেই স্কুলকে হাইস্কুল বানালাম, তার কেরানী ছিলাম বছর পনেরো, এখন রিটায়ার্ড। নাতনির নাম কুররাতুলাইন রহমান। বি. এ. পাস করেছে। ওর বাপের আছেও অনেক আল্লার রহমতে। পঁচিশ বিঘে সম্পত্তি, কণ্ট্রোল, দালান কোঠা, আমারও কম নেই—ভাই যদি কষ্ট হয় তো নামাও আমাকে···'

'ওজন আছে আপনার, দুধ-ঘি খাওয়া হাড়।'

'তা খেয়েছি ভাই, কী বিষম ঝড় রে বাবা, আজ গরমও গেছে খুব, নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছিল, সাগরের ঠাণ্ডা হাওয়া আর মেঘ ছুটে এসে পড়েছে···কার কি ক্ষতি হল তার কি আর হিসাব রাখার সময় আছে ?'

গাজি সাহেবকে আবার পিঠে তুলে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মেহ্‌দি ইমাম বলল, 'পৃথিবীতে নিত্য ভাঙাগড়া হচ্ছে, যা কিছু জীর্ণ পুরাতন তা ভেঙে গুঁড়িয়ে যায়। আবার নতুন জিনিস গজায়। কাল-বৈশাখীর ঝড়ে অনেক মহীরুহের শুকনো ফল মাটিতে পড়ে যায় বর্ষায় তারই বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্গম হবার জন্যে। এইভাবে সৃষ্টির কাজ চলেছে···'

ঝড় থেমে এলো। বৃষ্টির বেগও কমেছে। কিন্তু আবার নতুন মেঘ এসে বিদ্যুৎ ঝলকাচ্ছে মানুষকে ভয় পাইয়ে দিয়ে।

নার্শারীতে এসে পৌঁছলো মেহ্‌দি ইমাম। ঘর খুলে টর্চ জ্বেলে কুঁড়ে ঘরটার মধ্যে বুড়ো কর্মচারী জীবন অধিকারীকে পাওয়া গেল না। সে বোধ হয় সব ফেলে রেখে পালিয়ে গেছে। গাছপালা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

পাশাপাশি দুটি ঘর। একটিতে মেহ্‌দি ইমামের ল্যাবরেটরী। ঝড়ে বোধহয় তার ছিঁড়ে গেছে, ইলেকট্রিক পাওয়া গেল না। পাশের ঘরে শাড়ি, সায়া, ব্লাউজ ছিল, পরতে দিল মেহ্‌দি।

বেলা প্রথম কথা বলল এবার, 'এ কার কাপড় ? আপনার স্ত্রী কোথায় ?'

'স্ত্রী এখনো বাপের বাড়িতে, তার বিয়ে হয়নি। এ সব আমার মা আর বোনের কাপড়, তারা এখানে এসে থাকেন মাঝে মধ্যে। এটা তো শহরতলী, দূরে গ্রামে আমাদের বাড়ি।'

'আপনার ল্যাবরেটরী দেখে মনে হচ্ছে আপনি উদ্ভিদ বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ।'

'বিশেষভাবে অজ্ঞ! আপনি ফিটফাট হয়ে নিন—দাদুকে আমি পোশাক ছাড়িয়ে একটু ম্যাসাজ করে দিই।'

মেহ্‌দি ইমাম দাদুর পোশাক ছাড়িয়ে গা-হাত মুছিয়ে দিয়ে লুঙ্গি পরিয়ে কি একটা ক্রিম মাখিয়ে দিয়ে হাঁটু দুটোয় ওষুধ ঢেলে গজ কাপড় দিয়ে টান টান করে বেঁধে তাঁকে বিছানায় শুইয়ে দিল। তারপর ইঞ্জেকশন দিয়ে চাদর চাপা দিয়ে দিলে। আশ্চর্য, বৃদ্ধের কিছুক্ষণ পরেই নাক ডাকতে লাগল।

আর এ ঘরের একটু দোর ঠেলে দেখল কুররাতুলাইন নামাজ পড়তে বসেছে। মায়ের নামাজের মাদুরী আবিষ্কার করেছে সে। রঙিন মোটা মোমবাতিটার দীপ্ত শিখা বাতাসে কাঁপছে। কুররাতুলাইন অসামান্য সুন্দরী বটে। আর সুন্দরী বলেই প্রার্থনাটা ওর জন্য মানানসই আর প্রয়োজনও বটে, অন্তত চারিত্রিক দাম হয় তাতে।

মেয়েদের দিকে তাকাবার সময় হয়নি মেহ্‌দি ইমামের উদ্ভিদ বিদ্যায় ডক্টরেট হয়ে নিজের নার্শারী আর গবেষণা নিয়ে আছে। তবে সপ্তায় দু'দিন তাকে বক্তৃতা করতে যেতে হয় বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে। ক্রশবিড করে সে নতুন রকমের কত রকম ফুল, ফল, গম উৎপাদন করেছে।

ঝড় থেমে গেছে। বৃষ্টিও। চাঁদ উঠেছে আকাশে। বুড়ো জীবন অধিকারী এসে এখন কাশছে তার কুঁড়ে ঘরের মধ্যে।

টর্চ নিয়ে বাগানটা দেখতে যাবার মুখে বেলা জানাল, 'আমি যাব আপনার সঙ্গে বাগান দেখতে?'

'আসুন।'

'আমাকে তুমি বলবেন।'

দু'পাশে টবের সারি। সারি সারি কত কি গাছপালা। মেহ্‌দি ইমাম বলল, 'আমার নার্শারী থেকে রবার গাছের চারা যায় পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের দেশগুলোতে। ফুল আর ফলের চারা যায় অষ্ট্রেলিয়া, জাপান, আমেরিকা, কানাডা কত জায়গাতে। ইস্‌! জামরুল, পেঁপে, কলা, মালাইজাম, আম সব গাছই ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে। বাগান সাফ করতেই কত জন খরচা লাগবে। অনেক ক্ষতি হয়ে গেল।'

লণ্ঠন হাতে নিয়ে জীবন অধিকারী এসে বলল, 'বাবা, কী ঝড়! আমি কুঁড়েঘর ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলুম। কত লোকের ঘর পড়ে গেছে···'

'তুমি রান্না করতে জানো বেলা?'

'জী হাঁ।'

'তাহলে চলো, জীবন, একটা মুরগী বার করে দিয়ে যাও।'

স্টোভে রান্না করছিল কুররাতুলাইন। পাশে বসে চা খেতে খেতে গল্প করছিলেন দাদু মেহ্‌দি ইমামের সঙ্গে।

'নাতনি চমৎকার রান্না করতে জানে। সেলাই ফোঁড়াইয়েও ওস্তাদ। ভাল নজরুল-গীতি গায়। ভাল মতন একটা ছেলে পাচ্ছি না। এবার বিয়ে দিতে হবে বুনটির।'

নাতনি জিভ বার করে ভেংচি কাটল।

স্বভাবে এখনো ওর বেশ ছেলেমানুষী আছে, দেখে মৃদু একটু হাসল মেহদি ইমাম।

আহারাদির পর ইসমাইল গাজি বাইরের জ্যোৎস্নাপ্লাবিত আকাশ আর পৃথিবীর দিকে লক্ষ্য করে বললেন, 'কে বলবে যে আজ সন্ধ্যায় প্রচণ্ড ঝড়ে পড়েছিলাম আমরা! আমরা চলে যাব, পৃথিবী আবার নতুন সাজে সাজবে।'

কুররাতুলাইন গেয়ে উঠল, 'চরবে গরু, খেলবে রাখাল এই মাঠে···

মেহদি চমকে গেল, বেশ গলা তো—সেও যোগ দিল: তখন তুমি নাইবা আমায় ডাকলে, তারার পানে চেয়ে চেয়ে চেয়ে···

ভোর বেলায় ঘুম ভাঙল যখন কুররাতুলাইন পরিষ্কার শুনতে পেলে মেহদি ইমাম ফজরেব নামাজ পড়ার পর পবিত্র কোরআন পাঠ করছে।

উষার লগ্ন তখন। পুবের আকাশ লাল হয়েও ওঠে নি। দাদু অজু করছেন। কুররাতুলাইন অজু করে এসে নামাজ পড়ে নিল। দাদু নামাজ পড়ার সময় মেহদি কোরআন শরীফ পাঠ বন্ধ বেখে বাগানের দিকে চলে গেলে।

বাইরে তখনি অনেক লোকজন, ভ্যান, রিকৃসার ভিড়। নার্শারী থেকে গাছপালা নিয়ে যেতে লোক এসেছে। ভ্যান টেমপুতে টব উঠছে। জীবন অধিকারী গুনে গুনে তুলে দিচ্ছে। টাকা নিচ্ছে মেহদি ইমাম।

বসতে চেয়ার দিল কুররাতুলাইনকে। রোজ কত টাকার চারা বিক্রি হয় যে চাকরি-বাকরি না করেও একজন ডক্টরেট মানুষের পুষিয়ে যায়?

দাদুও বসলেন। মিষ্টি আর চা-পানির ব্যবস্থা করল মেহদি ইমাম।

দাদু শুধোলেন, 'কত টাকার চারা বিক্রি হয় ভাই রোজ?'

হাসল মেহদি ইমাম। পরিষ্কার ছকঝকে দাঁত তার। কবিসুলভ বড় বড় চোখে কী মিষ্টি হাসি। বলল, 'হয় বেশ, পাঁচ হাজার, সাত

হাজার, তবে শীতকালে দশ হাজার পর্যন্ত হয়। কিন্তু খরচ অনেক। সার, ওষুধ, টব, জনধন, বাইরে থেকে চারা আনতে হয়, কলম আনতে হয়। আড়াই হাজার রকমের গাছ-গাছালি আছে আমার বাগানে।'

কুররাতুলাইন বলল, 'বাগানটাও তো আপনার বিরাট।'

'হ্যাঁ, কুড়ি বিঘে। আব্বা প্রথম সূচনা করেন। মাত্র এক বিঘে জায়গায় তিনি ঝাউ, গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা, গাঁদা, পাতাবাহার, ডালিয়া, মরশুমী এইসব নিয়ে কাজ আরম্ভ করেন। তিনি অদ্ভুত খেয়ালী মানুষ। হেন দেশী গাছপালা নেই যে তিনি নাম জানেন না। তিনি আমাকে গাছ চেনাতেন। বলতেন, গাছের একটা জগৎ আছে, গাছই আমাদের বাঁচতে সাহায্য করে, অক্সিজেন দেয়, ফল, ফুল, শস্য দেয়। তাই আমি বোটানী পড়ি। ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে কেমন করে বৃহৎ মহীরুহের অংকুর ঘুমিয়ে থাকে, কেমন করে তার উদ্‌গম হয় এ সব লক্ষ্য করলে সৃষ্টি রহস্যের কুলকিনারা পাওয়া যায় না।'

গাজি সাহেব বললেন, 'মাটির ভিতরে কেঁচো থাকে, তার গায়ে মাটি থেকে কোন কোন উপাদান নিয়ে যে অতি সহজেই রক্ত জন্মায় আমরা ভেবে পাই না। মাছই বা পানির মধ্যে কি এমন উপাদান পায় যার দ্বারা তাদের শরীরে রক্ত জন্মায়? অথচ পৃথিবীর বড় বড় মাথার বিজ্ঞানীরা আছাড় কাছাড় করছেন এক ফোঁটা রক্ত তৈরি করবার জন্য। হয়তো একদিন তাও করবে কিন্তু কোষে কোষে তড়িৎ প্রবাহ করেও মৃত মানুষ বা জীব-জন্তুর প্রাণ তারা ফিরিয়ে দিতে পারবে না?'

মেহদি ইমাম হাসল। বলল, 'এসব অনেক গভীর তত্ত্বের ব্যাপার —বিজ্ঞানীরা বরং আরো গভীর করে জানেন সৃষ্টি রহস্য কত—জটিল আর বৈজ্ঞানিক। তাঁরা শুধু তো নকল করেন, বোঝেন, দেখেন আর সংবাদটা জানান।'

'তাঁরা কেউ অল্প একটু জেনেই বিশেষজ্ঞ হয়ে যান আর সৃষ্টিকর্তাকে ভুলে গিয়ে নিজেদেরই বাহবা দেন। পৃথিবীর কুড়ি হাজার বিজ্ঞানী মিলে কি আর একটা পৃথিবী তৈরি করে দিতে পারেন? শূন্যে এমনি ঝুলবে। দিন হবে, রাত হবে। মানুষ জন্মাবে, মরবে। একটা মানুষের

সঙ্গে আর একটা মানুষের মুখের মিল থাকবে না। প্রতিভা হবে তাদের বিচিত্র রকম। বিচিত্র রকম ভাষা! নারী পুরুষ।'

মেহদি বলল, 'নিউটন তো বলেছেন আমি জ্ঞান সমুদ্রের কূলে নুড়ি কুড়োচ্ছি মাত্র'—যাক গে, আপনাদের পৌঁছনোর ব্যবস্থা করছি। আমি আবার একটু বেরুব। কলকাতা থেকে নদীয়ায় যেতে হবে।'

'কী ভাবে আমরা যাব ভাই, আবার সেই বাসে?'

'খুব আতঙ্ক হয়ে গেছে না?'

কুররাতুলাইন পাতাল চোখ করে হাসল, বলল, 'আপনি আমাদের বাড়ি যাবেন।'

'অসম্ভব! সময় নেই।'

আহত হল কুররাতুলাইন। ঠোঁট ফুলিয়ে যেন কেঁদে ফেলবার ভঙ্গি করল। বলল, 'তবে কেন আমাদের বাঁচাতে গেলেন?'

'বারে! বাঁচাব না?'

'আর কাউকে তো বাঁচাতে যান নি? বাসে তো আরো অনেক লোক ছিল?'

'না, মানে, তাদের কেউ না কেউ দেখেছে নিশ্চয়ই।'

'ঘোড়ার ডিম দেখেছে। আপনি যেভাবে আমাকে পাঁজাকোলা করে বার করে আনলেন তা একমাত্র হিন্দী সিনেমার নায়করাই পারে।'

মেহদি ইমাম বোধহয় রেগে গেল। তার কপাল কোঁচকাল, ভুরু নাচল, চোখের তারা দপদপ করে উঠল।

বলল, 'ঝড় বৃষ্টিটাও কি আমার পূর্ব-পরিকল্পিত ছিল? তোমার দাদুকে বয়ে আনার ব্যাপারটা। দেখ, আমার কোনো ইন্টারেস্ট নেই।'

'তাই তো দেখছি, কেবলই দায়সারা। তবুও কৃতজ্ঞতা জানাই। তবে আমরা মরে গেলেই বোধহয় ভাল হত। আপনার মতন অত কাজের লোক আর গুণীমানুষের পশুর মতন পরিশ্রম হত না। আমাদের মতন তুচ্ছ লোকের জন্যে আপনার কত ভোগান্তি হল। ঠিক আছে, আপনার কাজ থাকে যান, আমরা এখন যাব না—

এখানে থাকব, ঘুমোব আর এই বাগানের ফুলের গন্ধে ভেসে বেড়াব।'

'শুনছ ভায়া, মাথা গোলমাল হয়ে গেছে আমার নাতনীর, কাজেই আমরা বোধহয় বড় রকমের ব্যবস্থার মধ্যে জড়িয়ে পড়ছি।'

মেহদি ইমাম কুররাতুলাইনের সলজ্জ চোখের দৃষ্টির মধ্যে হঠাৎ যেন ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। আর উঠতে পারল না। আকুলি বিকুলি করতে লাগল। তার হাত ধরে পাশের ঘরে টেনে নিয়ে গেল কুররাতুলাইন। বলল 'কসম করুন, যাবেন আমাদের বাড়ি?'

স্থিরভাবে কুররাতুলাইনের মুখখানার দিকে তাকাল মেহদি ইমাম। চিলের ডানার মতন ভুরু, নিখুঁত খাড়া নাক, দীঘল নীলাভ চোখ, পাকা তেলাকুচোর মতো ঠোঁট। যৌবনের পরিপূর্ণতায় যেন শিল্পীর হাতে তিল তিল করে গড়া ওর শরীর। বলল, 'আচ্ছা কথা দিলাম, যাব একদিন। ঠিকানা রেখে যাও। বরং চিঠি লিখো, আমি একটা দিন ঠিক করে যাবার তারিখ জানাব।'

'সত্যি, আপনি কি ভাল মানুষ!'

'যাও এবার, জীপ এসে গেছে। নিশীথ দে, আমার ছাত্রবন্ধু, ওকে খবর পাঠিয়ে বলেছি, বাড়ি পর্যন্ত দিয়ে আসবে।'

গাড়িতে উঠে বসতে দুজনের হাতে দুটি গোলাপকুঁড়ি কেটে ধরিয়ে দিল মেহদি ইমাম।

ইসমাইল গাজি বললেন, 'বহুৎ বহুৎ শুকরিয়া, যেও ভাই আমাদের বাড়ি, গাড়ির তেলের দামটা কিন্তু ভাই আমরা দিয়ে দেবো।'

'হাঁ নিশ্চয়ই দেবেন, দেওয়াই তো উচিত, তবে নিশীথদের যদি খনি থাকে আলাদা!'

নিশীথ বলল, 'আমরা ভাড়া খাটাই না 'স্যার।' গাড়ি বেরিয়ে গেল!

মেহদি ইমাম কিছুক্ষণ ওঁদের কথা ভাবল। গত সন্ধ্যার দৃশ্যটাও মনের মধ্যে দিয়ে ভেসে গেল। তার এখন ভাবতে আশ্চর্য লাগল যে ইসমাইল গাজির মতন এক বুড়োকে সে পিঠে করে বয়ে এনেছে প্রায় মাইলখানেক পথ। ঝড়ের পূর্বলক্ষণ দেখে বা রেডিওর ঘোষণা শুনেও

বোধহয় পথে বের হওয়া ঠিক হয়নি। যাচ্ছিল কেবল মা বিশেষ করে ডেকে পাঠিয়েছেন কেন সেই জন্যই।

কয়েকদিন পরে কুররাতুলাইনের চিঠি এলো। শুধু এক লাইন লেখা : 'পথ চেয়ে আছি'—নিবেদিতা

কুররাতুলাইন রহমান

সঙ্গে একখানা হাস্যোজ্জ্বল ফটো। ফটোখানা খুবই ভাল উঠেছে। কিছুক্ষণ দেখে রেখে দিল মেহদি ইমাম।

কত অধ্যাপিকা, কত এম-এ পাশ মেয়ে তাকে বিয়ে করতে চেয়ে কত চিঠি দেয় সে সব ঝুড়িতে ফেলে দেয় মেহদি ইমাম, কিন্তু কুররা-তুলাইনের ফটো আর চিঠিটা রেখে দিল ডায়েরীর মধ্যে। ভাবল, যাব একদিন, কিন্তু কবে দিন ঠিক করতে পারল না।

মা এলেই খুব আনন্দ। খাওয়াটা ভাল হবে। আর যতক্ষণ না সে ঘুমোবে মাথা টিপে দেবেন। এমনি এক সময় মা মাহমুদা খাতুন বললেন, 'খোকন, একটা কথা বলব?'

'বিয়ের কথা তো?'

'হ্যাঁ।'

'মুসলমান লোক বিয়ে করেন নি সাধু সজ্জন হয় আছেন এমন দেখেছ?'

'থাকবে কি করে? বিয়ে যে সুন্নত রে। পবিত্র কর্তব্য। নইলে বেচাল হয়ে যায় মানুষ।'

'কই আমি তো বেচাল হই নি?'

'হোস নি, হতে কতক্ষণ, শয়তান দাগা দিতে পারে।'

'মা, শয়তান বেচারা নাকি মহাজ্ঞানী পণ্ডিত, বিদগ্ধ ব্যক্তি কিন্তু ভদ্রলোকের সঙ্গে তো আমার একদিনও দেখা হল না!'

মাহমুদা মৃদু একটু হাসলেন, বললেন, 'শয়তানের জ্ঞান কোনো কাজে লাগবে না। তার প্রশংসা করা, তাকে প্রশ্রয় দেওয়াও বিপদ। অভিশপ্ত হওয়া বা বিভ্রান্তির মধ্যে যাওয়া মানেই হল দোজখ ভোগ করা।'

নিজের গবেষণা কাজে মন থাকলেও হঠাৎ মায়ের মুখের দিকে তাকাল মেহদি ইমাম। বলল, 'মা, তুমি তো বেশি লেখাপড়া শেখোনি ; এমন সারগর্ভ কথা বলো কি করে ?'

'বলি সত্যের দিকে চেয়ে, জীবন থেকে জেনে, তোর বাপ তো আর কম জ্ঞানী লোক নন।'

মেহদি ইমাম ভাবল আমার আব্বা ফোচ্কে চেহারার চিরতরুণ যুবক যেন। কোনোকালেই তার দাড়ি-গোঁফ হল না। যেন তের চোদ্দ বছরের কোনো বালক। গলার স্বরও তেমনি। নার্শারীতে বসে হুঁকো টানতে থাকলে নতুন লোক যারা তাঁকে চেনে না বা আদৌ দেখে নি কোনোদিন তারা খুব আমোদ পেয়ে হাসে।

আব্বা কিন্তু বিষয়বুদ্ধি আর রসবোধে পাকা জিনিস।

ইশার নামাজ পড়ার পর মা আবার কাছে এসে বসলেন। বললেন, 'তুই হয়তো ভাবছিস তোর মতন বিদ্যের জাহাজঅলা কোনো মেয়েকে বিয়ে না করলে তোকে সে তেমন কিছু বুঝবে না বা জীবনটা বিফল হয়ে যাবে। অনেক লেখাপড়া জানা বয়স্থ মেয়ে ভাল, কিন্তু সে ফুরিয়ে যায়, তার মধ্যে বোধহয় আর কিছু থাকে না, আর তারা নিজেদের ব্যক্তিত্ব, গাম্ভীর্য, অহংকার নিয়ে আলাদাভাবে বাঁচতে চায়! আমাদের আমল দেবে না, অশিক্ষিতা বলে মনে মনে ঘৃণা করবে। তোর বউ হলেও আমাদের পরিবারের একজনও তো হবে? শিক্ষিত লোকরা সহানুভূতিহীন হয়, একালে সেটা বড় দোষ। তোর মামারাই তার নমুনা, একজন ডাক্তার, একজন উকিল, একজন ইঞ্জিনিয়ার, একজন প্রফেসার—কিন্তু কারো সঙ্গে কারো সদ্ভাব নেই।' মা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন, পরে আবার বললেন, 'তোর কাছে যে সব তোর অধ্যাপিকা বা শিক্ষিকা বান্ধবীরা আসে—যাদের আমি দেখেছি—তারা কেউই তোর স্ত্রী হবার যোগ্য নয়।

'না মা, সে রকম আমি কাউকে ভাবিনিও।

'মা হলেও বলছি, বেহেস্তে যে হুর দেওয়া হবে বলা হয়েছে নিশ্চয়ই ওদের মতন নয়।'

মেহদি ইমাম এবার খুব হাসল। আব্বা শুনলে হয়তো বলতেন, 'শয়তানের ওপরে রাগ হলেও আল্লা তাকে এমন চিজ ঘৃণাভরেও ছুঁড়ে দিতেন না।...'

হঠাৎ আব্বার গলার সাড়া পাওয়া গেল। মাহমুদা দোর খুলে দিয়ে বললেন, 'অমনি পিছনে পিছনে দৌড়েছ এখন আর খানাপিনা মিলবে না।'

আরে আমি একেবারে একটা ঘটনাকে উপড়ে নিয়ে হাজির; চলো বলছি।

ভেতরে এসে বসতে বসতে মোল্লা কাজেম আলি বললেন, 'খোকার সব গরজাস ব্যাপার। আমি হলাম ছোট চিড়িয়া, এখনো লেডিসিটে বসতে পাই। খোকা কোনদিন মানুষের সঙ্গে গরুর জোড়কলম লাগিয়ে দেবে, ওপরের বাবু অফিস করে দু'হাজার টাকা মাইনে পাবে আর নিচের দিকে ১০।১৫ কেজি দুধও দেবে।'

মা বললেন, 'কি ঘটনাটা তাই বলো।'

চুরুট ধরালেন কাজেম আলি, বললেন, 'তুমি ঠিক চলে আসার পর লালদাড়ি এক বুড়ো এলো। নাম ইসমাইল গাজি। মহম্মদপুরের আমার মামাতো ভাই কন্ট্রোলঅলা রহমানের নাকি তিনি শ্বশুর! তা হবে। দূর সম্পর্ক। কে আর কার খোঁজ রাখে। রহমানের নাকি একটা অপরূপ সুন্দরী কন্যা আছে। বি-এ পাশ। খোকা নাকি ঐ বুড়ো আর এই সুন্দরী নাতনীকে ঝড়ের সময় গাড়ি উল্টে যেতে টেনে-টুনে প্রাণে বাঁচায়। তারপর এই নার্শারীতেও তাদের সেই দুর্যোগ রাতে ঠাঁই দিয়েছিল। বুড়োকে পিঠে করে বয়ে এনেছিল হাঁটুতে চোটচাট লাগার পর। এমন মহানুভব ছেলে নাকি জীবনে তিনি দেখেন নি।'

'হ্যাঁরে খোকা?'

'ঐ ঝড়ের দিন, ঐ রকম একটা ঘটেছিল, তুমি জরুরী তলব দিলে, তাই বাড়ি যাচ্ছিল, পথে বাস উল্টালো।'

'মেয়েটা কি রকম, দেখতে ভাল।'

কাজেম আলি তাঁর স্বভাবসুলভ রসিকতা করল, 'নারী সৌন্দর্যের

ও কতটুকু কি জানে, ভুক্তভোগী হলাম আমি, অবশ্য একমাত্র তুমিই হলে তার উৎস।'

'চুপ করো, কখন কোথায় কি বলতে হয় তোমার হুঁশ থাকে না।'

'সেইজন্যেই তো আমার কিছু হল না। তবে এ মেয়েকে আমি বছর পাঁচেক আগে দেখেছি—একেবারে যাকে বলে হুর।'

মেহদি ইমাম এবার বলল, 'তা দেখতে ভাল, ও একটা চিঠি আর ফটো পাঠিয়েছে।'

ফটোটা দিতে দুজনে দেখলেন লোফালুফি করে ছেলেমানুষের মতন। তারপর দুজনেই খুশী।

কাজেম আলি বললেন, 'দোহাই বাবা' শহুরে মেয়ে বিয়ে করিস নি। আমাদের ম্যানার কার কার্টনি শেখাবে। সবেরই মাঝারি ভাল। আমি তাহলে দেখতে যাই?'

'মায়েরও যাওয়া দরকার।'

'কেন কেন? আমি মেয়ে চিনব না?'

মাহমুদা বললেন, 'তা নয়, তোমার তো আবার বয়স কম, যদি আবার কেউ মেয়ে দেবার জন্যে ধরে বসে!'

মা বাবা দুজনেই পরের দিন মেয়ে দেখতে গেলেন, ফিরে এসে জানালেন তাঁরা সর্ববিষয়েই খুশী। মেয়ের বাপ নাকি প্রচুর টাকা ব্যয় করবেন কিন্তু মাহমুদা বলে এসেছেন, 'আমরা কিছুই নেবো না, আমরা মেয়ে নিয়ে যেতে এসেছি, অর্থ সম্পদ নয়। আল্লা যা দিয়েছেন তাই আমাদের কাছে যথেষ্ট।'

নামাজ ভুল হয়ে যেতে লাগল আজ মেহদি ইমামের। ঝড়ের কোলে পাশাপাশি কুররাতুলাইনের কাছে শুয়ে পড়ে বজ্রপাত, আর বাঁচার দৃশ্যটা তার মনে পড়তে লাগল।

কুররাতুলাইন মানে কি আকাশের বিদ্যুৎ?

হিমু মোড়লের লেগামে কদফদে ঘা। মাথায় চাঁদের মতন টাক। উরু চুলকোয় ঘষোর ঘষোর করে। সব ক'টা আঙুল একত্র করে বিড়ি ধরে সোঁ সোঁ করে দম মারে। খ্যাঁক খ্যাঁক করে খ্যাঁকশিয়ালের মতো কাশে। হিমু মোড়লের কাশির শব্দ সাত গাঁয়ের লোকের পরিচিত। সে যখন রেগে যায়, বা বিষয় সংক্রান্ত কথা বলে তখন ডান কাঁধটা নাচতে থাকে ফিঙে পাখির ন্যাজের মতন। হিমু মোড়লের দেঁতড়ি বউ প্রায় উদোম পাদাম হয়ে গোয়াল কাড়ে, কাঁকালে কাঁকালে করে গোবরের ঝোড়া বয়, কঞ্চিপালা পাঁজা করে বয়ে আনে, পাল খানেক ছাগল তেড়ে মাঠে নিয়ে যায়, খচ্চর ষাঁড়টা প্রায়ই তাকে হিড়হিড় করে বাতাসে কাপড় উড়িয়ে টেনে নিয়ে যায়—আর কিছুতেই দড়ি না ছেড়ে দিয়ে ঝুলতে ঝুলতে নিঁআকড়ের মতো হিমুর বউ হেতালী দাসী ছুটতে থাকে, গাল দেয় পচাল পেড়ে। যদি কেউ দেখতে পায় তো দেঁতড়ো দাঁত বার করে খল খল করে হাসে। ষাঁড়টা এত খচ্চর বিদায় করে না কেন, শুধোলে হেতালী বলে, 'হ্যাঁ ওকে আমি বিদায় করব! আমার পয়সা উপায়ের যন্তর ওটা। হপ্তায় পাঁচটা টাকাও রোজগার হয় ঐ ষাঁড়টা থেকে গরু বলদ ধরিয়ে।

একটা পাঁঠাও আছে হেতালীর। তা থেকেও রোজ পাঁচ গণ্ডা পয়সা পায় সে ছাগল ধরাতে এলে।

শুধু মোরগের ফি সে নেয় না বা নিতে পারে না। পাড়ার মুরগীদের হরদম ডিম পাড়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে।

হেতালীর ঘুঁটে বেচে, কঞ্চিপালা বেচে, তাল, আমড়া, কলাপাতা, ঝাঁটাকাঠি বেচে, বারো সতেরো করে অনেক টাকা জমেছে। হিমু মোড়ল যখন বাগদিপাড়ার শংকর সরদারের বাড়ির নিচের জমিটা

কেনে শত খানেক টাকা চাইতেই হেতালী ক্যারক্যার করে উঠল, টাকা আমার কাছে শুয়ে আছে। তুমি বছরে একখানা কাপড কিনে দাও? শংকর বাগ্‌দির তাগড়াই মেয়েটার দিকে চোখ পড়েছে বোধ হয়? ঐ জমিটায় এবার আনাজ ফসল চাষ করাবে আর অভাবী বাগ্‌দির মেয়েরা কিছু চুরি করতে এলেই ধরবে। তুমি তো পাড়ার মোড়ল নয়, পাড়ার মোরগ। সাত গণ্ডা মেয়ের তুমি নাগর। কার অভাবে কাপড় দিচ্ছ, কাকে মুদিখানা থেকে ডাল-আলু তেল কিনে দিচ্ছ। কাকে চাল দিচ্ছ ধান দিচ্ছ, তোমার টাকার অভাব! পাট বাঁশ কলা পান উলু প্যাকাটি খড় ধান-মাছ বেচা টাকাগুলো কোথায় যায় শুনি?

হিমু বলে, শালা সাত গাঁয়ের আমি বিচার করে বেড়াই আর আমার ঘরে বিচার করে কে?

হেতালী বলে—লোকে বলে, হিমু মোড়ল পরের বিচার করে ভাল। তোমার বিচারও ভগবান করছে, দেখতে পাচ্ছ না? কথায় বলে সাপুড়ের মরণ সাপের হাতেই। পরের মেয়েদের নষ্ট করে বেড়ালে ঘরের মেয়ের যৌবনও কাকে ঠুকরে খাবে। কই তোমার মেয়ের ঘর হল? জামাইকে গরুর দড়ি দিয়ে বেঁধে মেরে কাস্তে দিয়ে তার কান কেটে নিলে তবু ঘর হল? সোমত্ত মেয়ে এখন তোমার একটা মেয়ে কোলে নিয়ে বাপের ঘর উজ্জ্বালা ক'রে পড়ে আছে। তোমার পাঁচটা ব্যাটা পাঁচ অবতার হয়েছে। কাউকে আর লেখাপড়া শেখাতে পারলে না। বড়টা চোর, ঘরের থালাঘটি মুরগী আনাজ যা পাবে লুকিয়ে বেচবে, পরের মুরগী চুরি করে কতবার মার খেলে। তার বউটা সারারাত তোমার ঘামাচি মেরে, গা টিপে না দিলে আবার তোমার ঘুম হয় না। দু'নম্বর ছেলেটা গোঙা। সেই সাণ্ডা চেহারার গোঙা ছেলে একদিন দেখি গোয়ালঘরের মধ্যে তার ভাতারছাড়ী বোনের সঙ্গে ইয়ে করছে। ঝ্যাটার বাড়ী দিতে তবে গোঙাটা ছাড়ে! গোঙার বউ এখন তোমার বড্ড খাতির করে। সেজো ছেলের কানে পুঁজঅলা বড়লোকের হোঁদল কুতকুতে মেয়ে এনে বউ করে দিলে, সেও তোমার হাত রেখেছে। ন' সেজোটা ইস্কুলের মেয়েদের অশ্লীল কথা বলে

কতবার মার খেতে গেল। থানা পুলিশের পেট ভরিয়ে ছাড়ান করিয়ে আনলে ছোট ছেলেটা সবে চোদ্দ বছরের, সে এখনি ছাগল 'ধরানী পয়সা চুরি করে তোমার তিনতলা পাকাবাড়ি, একশো বিঘে নামী-বেনামী জমি, সিয়ারে 'ট্যাসকি' চলতেছে, ট্যাকটর কিনেছ, ন'সেজো বেটা হাতে ঘড়ি বেঁধে ট্যাকটর চালাচ্ছে। তোমার আবার টাকাব অভাব?

হিমু মোড়ল এতক্ষণ টাকা গুনছিল। নোটের তাড়া। স্ত্রীর কথায় কান দিচ্ছিল না। এ সবই পুরোনো কথা। তবু সে মোড়ল। সবাই নমস্কার ঠোকে পথে বের হলে। কিন্তু হেতালী তাকে মানে না। কতবার চ্যালা কাঠের বাড়ি মেরে ফাটিয়ে ফেলেছে, কতবাব শিকল বন্ধ করে রেখেছে। তবু ওর খরিশ কেউটের বিষ ভাঙে না।

শংকর সরদার লেঠেল, বাগদিটাও তাকে মানে না। বেটার 'তালব্য শ' বাঁধতে কানি নেই এদিকে চহরম আছে খুব। বলে হিমু মোড়ল আবার একটা মানুষ! ওর গায়ে যত লোম আছে তার সমান মেয়ে বেটা নষ্ট করেছে। মায়ের যৌবন গেলে মেয়ে, মেয়ের যৌবন গেলে নাৎনী, শালা যেন ছিবেষ্ট। কপালটা ভাল। পরের জমি বন্ধক রেখে, পরের মালঝাল নিয়ে বড়লোক। আর থানার বড়বাবু মেজো-বাবুকে হরদম পোনা খাসী মদ ডিম নারকোল চাল যোগান দেয়। তাই যাকে ইচ্ছে বলে, এই বেটা তোর কোলজেটা উপড়ে নোব। আমার পাল্লায় পড়লে আমি ওর আস্ত মুণ্ডুটা মুচড়ে ছিঁড়ে নোব।

হিমু মোড়ল যতদিন না শংকর সরদারকে জব্দ করতে পারছে ততদিন তার ঘুম নেই। সে এবার প্ল্যান মাফিক চলল। ঐ হেতালীটা ঠিকই ধরে ফেলেছে ও ঠিক তাকে বুঝতে পাবে। হবে না, পঞ্চাশ বছর বয়সের লোকটাকে নিয়ে সে আজ প্রায় তিরিশ বছর ঘর করছে।

শংকর বাগদির ঘরের নিচের জমিটা কিনেই হিমু মোড়ল ট্রাকটর চালিয়ে পাট ফেলে দিল।

শংকরের মেয়েটার দুরন্ত যৌবন এসেছে প্যাটপেটে বড় বড়

চোখ। ডাগড়াই বুক। চললে পাছা নড়েচড়ে। শংকর ডাকাতি কেসে পড়ে মেয়াদ খেটে এসেছিল বলে সহজে আর কেউ ওর মেয়েকে ঘরে তুলতে চায় না। যে ছোঁড়া দেখতে আসে হিমু মোড়লের লোকজন তাকে ভয় দেখায়। জামাই হলে বেঁধে পিটবে।

শংকর সরদার যে ডাকাত সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। কখন সে কোথায় থাকে কেউ জানে না। তার বউ কচু শাকপাতা বিক্রি করে সংসার চালায়। একটা উলুর কুঁড়ে ঘরে তার জল পড়ে। পরের তাল নারকোল কুড়িয়ে আর শাকপাত তুলে পেট চলে।

হিমু মোড়লের ক্ষেতের পাট বেড়ে উঠল। একদিন হিমু এসে দেখল পাটগাছের ডগা কাটা। পাটশাক তুলেছে কারা। দেখে সে কিছুই না বলে বাড়িতে চলে গেল।

পরদিন ঠিক তুপুরবেলা অন্যদিক দিয়ে এসে পাটবনের মধ্যে সে লুকিয়ে বসে রইল। ঘণ্টা তুই চলে গেল। মশা কামড়াতে লাগল। জোঁক ধরল তুটো। এক বাণ্ডিল বিড়ি ফুরিয়ে গেল। তারপর দেখা গেল শংকরের জোয়ান মেয়ে কুরচিটা আসছে পাটক্ষেতের দিকে।

বুকের ভেতরটায় ধড়াস ধড়াস করতে লাগল হিমু মোড়লের। পঞ্চাশ বছর বয়সেও তার এখন যৌবন খেলার উত্তাপ আদৌ কমে নি। নতুন নতুন মেয়ে পেলেই সেটা টের পায়। রোজ সে এক কেজি করে তুধ খায়। চেহারা ভরভরাট আছে। মাথার চাঁদিতে সে একবার খুশীতে চাপড় মারল।

কিন্তু কুরচি তো পাটশাক তুলতে এলো না। পাটক্ষেতের পাশে বাঁধা গাইগরুটার কাছে গেল। ওঃ! গোবর কুড়োতে এসেছে তাহলে!

গোবর নিয়ে ফেরার সময় যখন কুরচি পাটক্ষেতের ঠিক কাছ বরাবর এলো। হিমু মোড়ল বেরিয়ে পড়েই তার হাত ধরল। বলল—এই ছুঁড়ী, পাটশাক তুলতে এসেছিস কেন?'

'হাত ছাড়ো। কে তোমার পাটশাক তুলছে? আমি তো গোবর কুড়োতে এইচি।'

হিমু তাড়াতাড়ি তার নিজের গামছায় তুলে রাখা পাটশাক নিয়ে গুঁজে দিল কুরচির পেট কাপড়ের মধ্যে। বলল, 'এগুলো কে তুলেছে শুনি?'

'এ্যা! নিজে তুলে আমার কাপড়ের মধ্যে গুঁজে দিয়ে দিলে! হাত ছাড়ো বলচি, আমি চেঁচাব।'

হিমু স্বর পালটাল। বলল, 'এই কুরচি, তোল না, পাটশাক তোল, যত পারিস তোল কিচ্ছু বলব না। রোজ তুলবি। আমার কি অভাব। তোদের জন্যেই তো পাট ফেলেছি আমি। তোল না, তোল।'

'না ছেড়ে দাও। আমাদের পাটশাকের দরকার নেই।'

'তবে রে মেয়ে, ষোল কচ্ছুরী ছুঁড়ী—আয় তোকে পাটক্ষেতের ভেতর টেনে নিয়ে যাব; দেখি তোর কোন বাবা এখন রক্ষে করে!'

'বাবা! মাগো! ও বাবা। পাটক্ষেতের ভেতরে আমাকে···।'

গালটা চেপে ধরল হিমু মোড়ল। সে তখন উত্তেজিত, ভীত—কামার্ত। তার কোমরের কাপড় খুলে গিয়েছিল। পাটক্ষেতের মধ্যে দুজনে ঝটাপটি করছিল তখন। কুরচি কামড়ে দিয়েও নিজেকে ছাড়াতে পারল না! মাটিতে পেড়ে ফেলেছে তাকে হিমু মোড়ল।

বাগদি পাড়া থেকে তখন শড়কি বল্লম লাঠি নিয়ে ছুটে আসছে লোকজন!

শংকর সরদার হাঁক মারল, 'কুরচি—তুই কোথায় কুরচি!'

কুরচি গালটা ছাড়িয়েই চেঁচিয়ে দিল। 'বাবা।' তারপর সে হিমু মোড়লের পায়ে জড়িয়ে ধরল। পালাতে চাচ্ছে হিমু। পিঠে লাথি কীল চড় পড়ছে তার। তবুও ছাড়ে না কুরচি।

তিন লাফে পাটবনের মধ্যে ঢুকে পড়ে শংকর বাগদি টেনে আনল হিমু মোড়লকে। মোড়লকে হাত মুচড়ে পায়ের কাছে ফেলতেই কুরচি তার বেশবাশ ঠিক করে নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'আমি গোবর কুড়োতে এসেছিলুম, যাবার সময় ঐ ছোটলোক আমাকে ধরে পাটক্ষেতের ভেতর টেনে নিয়ে গেল।'

'তবে রে শালা বেইমান!'

'ছেড়ে দে বাবা। ও পাটশাক তুলছিল, তোকে দশ কাঠা জমি দোব।'

'শালা! মার শালাকে! মেবে ফেল দেশের আপদ। দুনিয়ার আপদ।'

শংকর শড়কিটা নিয়ে হিমু মোড়লের পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল যখন সে দেখতে পেল তার মেয়ে কুরচি ধর্ষিতা হয়ে গেছে।

ভেলার মত ভেসে চলাই ওদের জীবন

'আমরা অহম। অসমিয়া মুসলমান বেদে।'

'তোমার নাম কি?'

'আমিনা খাতুন।'

'তোমার বিয়ে-সাদি হয় নি, এত বড় হয়ে গেছ?'

'তুমি বিয়ে করবে।' হেসে দীঘল চোখ মেলে কটাক্ষ হাসল আমিনা।

আমিনার চওড়া কোমর, চওড়া বুক, পাঁচফুট উঁচু দোহারা চেহারা, ফরসা রঙ। সবুজ শাড়ি পরনে। কত কি জড়িবটি বিক্রি করতে এসেছে পাড়ায়। বন্ধ্যারোগ, ঋতুবন্ধ, বাতাস লাগা, ভূত ধরা, সাপে কাটা, কানে পুঁজ, বাত সারানোর দাওয়াই আছে আমিনার পুঁটুলিতে।

সিপার ক্যামেরা ঘাড়ে করে ঘুরে বেড়ান পাশ-করা বড়-বাড়ির বেকার ছেলে। তার চোখে আমিনাকে অদ্ভুত লাগল। বসাল সে টিনের ঘরের লাল সিমেণ্ট করা দাবায়। তার দাদি বলল, 'তুমি মুসলমানের মেয়ে? বেদের দলে ঘুরে ঘুরে বেড়াও দেশে দেশে?'

'হ্যাঁ বুবু, বাত আছে নাকি তোমার? কোমর হাঁটু ধরেছে? এস দেখি, সারিয়ে দিচ্ছি।'

আমিনা বুড়ি দাদি-আম্মাকে টেনে নিয়ে বসাল।

কত কায়দা, কত চং আমিনার। কাপড়-চোপড় সেঁটে বসে বুড়ির পিঠে কোমরে চড় চাপড় মেরে সাপের তেল দিয়ে দলতে-মলতে লাগল।

বুড়ি স্বস্তিতে উ-আ করতে লাগল।

পাড়ার ছেলেমেয়েরা জুটেছে রাজ্যের।

সিপার ক্যামেরা নিয়ে তাদের ছবি তুলতে লাগল। আমিনার যৌবন পরিপুষ্ট চেহারা। বুকের পাশটা দেখা যায়। দেখায় সে। হাসে সলজ্জ সচেতন চোখে।

গান গায় সে: গেঁটে বাত, খল্ বাত, সরে যারে তুই,/ বাবা আলি চাপড় মাড়ে কেঁপে ওঠে ভুঁই। / বুড়ির মাথা খেল বুড়ো / মাঝে মাঝে মারে হুড়ো / বুড়ির লাগে খিল্ /—কষ্ট দেখে ফাটে মোর দীল্। / যারে বাত যা হুরু রু রু রুহ পাতকোয়ার হাড় কোমরে বাঁধি / ছু মন্তর ছু···।' /

ঘণ্টা খানেক সেবা করার পর বুড়ি যেন চাঙ্গা হয়ে গেল।

সিপারের ছোট ভাইয়ের কানে পুঁজ ছিল আমিনা পরিষ্কার করে দিল। কানের গোড়ায় বামনহাটির এক গাঁট জড়িবটি সুতো দিয়ে বেঁধে দিল। আমিনা বলল, 'এর পেট ঠাণ্ডা রাখবে। চা, কাঁচা পিঁয়াজ, ঝাল, চর্বিঅলা গোস্ত, পান্তাভাত, শুঁটকি বা পচা মাছ, বাসি তরিতরকারি খেতে দিবেন না গো। এটা আমাশা রোগের মতই।'

সিগারেট টানতে টানতে বুড়ো আসক আলি এসে বসল। বলল, 'আমারও কোমরে বাত আছে। পূর্ণিমা অমাবস্যায় ধরে।'

'পাঁচটাকা করে দিতে হবে। কোমরের তো দোষ নাই গো বুঢ়া মিয়া। কটা বাচ্চা হল ? কত হাল-লাঙল বাইলে। বস দেখি।'

আমিনা সত্যি জাদু জানে।

পনেরোটা টাকা কামিয়ে নিল দু-ঘণ্টার মধ্যে। চাল ডাল আলু সিধে দিতে হল। হালুয়া রুটি চা খেল।

আর একটা বেদের মেয়ে এল। একটু বয়স বেশি। মুখের দু-পাশে

মেছেতার দাগ পড়েছে। তারও হাতে পুঁটুলি। পাড়ার অন্য বাড়িতে ঘুরে এসেছে। দুজনে কি সব বলাবলি করল ওদের দেহাতি ভাষায়। হাসল দুজনে।

আর দুটি ছেলেমেয়ে এল। তাদের মাথায় রাঙা রুমাল। হাতে ছড়ি কোমরে রক্ত শালুকের মেখলা। তারা উঠানের মধ্যে হাপু খেলা দেখাতে লাগল। তাদের সঙ্গে কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে চোখ ঠেরে ঠেরে নাচতে গাইতে লাগল আমিনা আর তার বুবুজান আস্‌মা খাতুন।

সিপার ছবি নিল ওদের।

বেদেদের ওপরে সে ডকুমেন্টারী ফিল্ম করবে বলে ধান্ধা। সারাদিন লেগে রইল ওদের পিছনে।

গ্রামে বল খেলবার মাঠে ওরা আস্তানা পেতেছিল। সারাদিন পরিশ্রম করে এসে সন্ধ্যার পর বাইশটা পরিবার ঠিকে উনুনে রান্না বসিয়েছিল।

বুড়া সাপুড়ে রহমতের মেয়ে তিনটি—আস্‌মা, আমিনা আর আজনা। আস্‌মার বাবরি চুল, বর আছে—দুটা ছেলেমেয়ে আছে।

ওদের সঙ্গে আছে মুরগী, ছাগল, মোষ, কুকুর, ভেড়া, গাধা, ঘোড়া। খেজুর পাতার চাটাই, হাঁড়ি, বাসন, লাঠি সড়কি ইত্যাদি।

সিপার বুড়ো রহমতের সঙ্গে ভাব জমাল। দু-বোতল চোলাই মদ এনে দিতে বুড়ো খুব খুশি। দুটো তাঁবু ওদের, মেয়ে জামাইয়ের আলাদা একটা। মোরগ জবাই হয়েছে বলে রান্না হচ্ছিল এক জায়গায়। রহমত বলল, 'আড়াই কেজি মাংস হবে বাবু। শালা খাসী করা মোরগ। বেচলে পঁয়ত্রিশ টাকা দাম। কুকুরটা কামড়ে দিল। যাক, খাই এখন।'

মশলা পিষছিল আমিনা। বাপের অনুরোধে সেও এক গেলাস মদ খেয়ে গেল।

'তোমাদের আদত বংশ পরিচয় কোথা থেকে জান?'

'আমরা অহম। প্রথমে চীন বা বর্মা থেকে ভারতে আসি। ব্রহ্মোপুত্তর নদীর ওপারে মোদের খুব জোর ছিল। মোগল রাজারা

মোদের জয় করতে পারেনি। অহমরাই কেউ কেউ মুসলমান হয়ে গেল। পাহাড়িরা তাদের তাড়াল। ঘরছাড়া সেইসব লোকরা আসামের বেদিয়া।'

'তোমরা ঘরবাড়ি করতে পার না!'

'কুথায় জায়গা পাব? পিথিমির এক কাঠা জমিনও বিনা মালিকানায় পড়ে নেই। আমরা ভাসা কাঠ। ভেসে চলেছি শালা।'

নেশা ধরেছে রহমত বুড়োর।

রান্না শেষ হতে হতে রাত নটা বেজে যায়। সিপারের নেমতন্ন ওদের বাড়িতে আজ। বুড়ো চেল্লাতে থাকে। মাটিতে চাপড় মারে। চোখ বুঁজে বসে থাকে।

আসমার বর ছুরি কাঁচি এইসব বিক্রি করে। চোখ লাল হলেও একটু নিরীহ স্বভাবের। তার নেশা হতে আসমা তুলে নিয়ে গিয়ে খাইয়ে শুইয়ে দিল।

আমিনা এসে বসল কাছে। চাঁদ উঠে এসেছে ওপরে। চারদিকে আলো। পাড়ার ছেলেরা বেদে আর তাদের জীবজন্তু দেখা শেষ করে চলে গেছে।

আমিনা আর এক গ্লাস মদ খেল।

এরা স্বাধীন—কেউ কারও ব্যাপারে নাক গলায় না। এক বাটি মাংস দিয়েছে আমিনা। আসমা আর একটু মদ খেয়ে গেল। সিপার একটু একটু করে খাচ্ছিল আর চাঁদের আলো পড়া আমিনার মুখের দিকে তাকাচ্ছিল।

সিপার শুধোল, 'আমিনা, তোমার সাদী হয় নি কখনও?'

'সাদী আর কি। বাপ দিল একটা পুরুষের হাতে। সে তিনমাস ছিল আমাদের সঙ্গে। তারপর বাপের তিন হাজার টাকা নিয়ে একরাতে ভেগে গেল। তার আর খোঁজ পাই নি।'

'কতদিন আগে।'

'হ্যাঁ, তিন বছর হবে।'

'তুমি পুরুষের সঙ্গ চাও না?'

জিব বার করে ভ্যাংচাল আমিনা। বাপকে তুলে খেতে দিল। শালপাতায় ভাত আর রান্না মাংস খেলো সিপার। কড়া ঝালমাংস। ঘাম বেরিয়ে গেল রগ থেকে।

আহারাদির পর ওরা সবাই শুয়ে পরল।

সিপার বলল, 'আমি এবার যাই।'

আমিনা বলল, 'যাও।' হাসল সে।'

সিপার নেশায় টলতে টলতে ফিরে চলল বাড়ির দিকে। কাল সে এসে ছবি নেবে। খুব ভোরেই আসবে সে। কিন্তু কাঁধে ক্যামেরা আছে ঠিকই কিন্তু মানিব্যাগটা ? তাতে যে একশ কত টাকা ছিল। পাশে বসে ছিল আমিনা। ব্যাগ খুলে টাকা নিয়ে মশলাপাতি সিগারেট কিনতে দেখেছিল ওরা। আবার ফিরে গেল সে।

আমিনাকে ডাকতে সাড়া দিল না সে। আমিনা, অজানা রহমত শুয়ে আছে পাশাপাশি। কুকুরটা গোঁ গোঁ করে সাড়া দিল। মোষ ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে।

ভয়ে ভয়ে আমিনার পায়ে হাত দিয়ে নাড়া দিতে উঠে বসল সে। রোষভরা দৃষ্টি। বলল, 'কি চাস্? ওঃ। তুমি ?'

'আচ্ছা টাকার ব্যাগটা দেখেছ ?'

'হ্যাঁ।' ছুঁড়ে ফেলে দিল আমিনা ব্যাগটা মাথার তলার চাটাইয়ের নিচে থেকে নিয়ে।

ব্যাগ খুলে দেখল সিপার—ফাঁকা।

আমিনা তার ভাব দেখছে। বলল, 'কিছু নাই।'

'না।'

উঠে এল আমিনা। হাত চেপে ধরল। বলল, 'কেটে ফেলবে, পালাও। মোর জন্যে সাত সাতটা মরদ মোর বাপের হাতে খুন হয়ে মরেছে। বাপ তোর টাকা পকেট মেরে লিয়েছে।'

'ঠিক আছে। আমি চলে যাচ্ছি।'

কিন্তু হাত ছাড়ল না আমিনা। ভয় পেল সিপার। গ্রামের চারদিক এখন নীরব।

আমিনার চোখ দুটো সাপিনীর মত ধক্ ধক্ করছে। তার বুকভরা যৌবন। নেশায় সিপার টলছে।

'বাপকে ডাকব, টাকা চাইবে?'

'না। থাক।'

'তাহলে আয়।'

'কোথা?'

'আয় না—।' হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল আমিনা নারকেল সুপারির ঝোপটার ভেতরে। বলল, 'আয় বসি এখানে।'

বসল সিপার।

আমিনা হঠাৎ ওর বুকে মাথা রেখে কাঁদতে লাগল। তাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে সিপার বুঝল চরম উত্তেজনায় তারা দুজনেই বিহ্বল প্রায়।

আমিনা বলল, 'আমাকে তুমি কোথায় নিয়ে পালাবে?'

'কেন, তোমার আর বেদে জীবন ভাল লাগে না?'

'না, আমিও ঘর সংসার চাই। বাপ আমাকে মারে। কোনও পুরুষের সঙ্গে মিশতে দেয় না। তোমার মত কত লোক আমার রূপ যৌবন দেখে পাগল হয়ে ছুটে আসে। তুমি কত ভাল। কত সুন্দর তোমার চেহারা—তোমার মন। তোমরা সভ্য ভদ্দর লোক। জানি, আমাদের ঘরে নেবে না।'

হঠাৎ ডাক পড়ল বুড়ো রহমতের, 'আমিনা।'

'আসছি বাপ, বাইরে এসেছি,—এই পালাও তুমি এদিক দিয়ে। আমি চললাম।'

আমিনা পালিয়ে গেল। সিপার কিন্তু বসে রইল। বুড়ো কী করে, কী বলে দেখা যাক।

'কোথা গেছলি হারামজাদী।'

'বাইরে গেলুম ত—'

'ছেনালী।' মারতে লাগল রহমত বুড়ো। আমিনা মার খেতে লাগল। কাঁদল না। আসমা জেগে গিয়ে এসে তাকে ছাড়াল। বুড়োকে টেনে সরিয়ে দিল।

সিপার আর ওদিকে গেল না। সকালে এসে শুনল ভোরবেলাতেই নাকি বেদেরা চলে গেছে।

—আর তিনটে বাড়িতে সিঁদ কেটে চুরি হয়ে গেছে প্রচুর টাকা আর সোনা।

সিপারের দলবল ছোটে সাইকেল নিয়ে চারদিকের বিশটা গ্রামে কিন্তু বেদেদের সন্ধান পেলে না।

পরে জানল হুগলী নদী পার হয়ে তারা চলে গেছে উলুবেড়িয়ার ওদিকে কোথায়।

নিরাশ হয়ে বাড়িতে ফিরে সিপার মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে লাগল আমিনার কথা। তার সেই দীঘল মায়াময় চোখ আর পরিপূর্ণ যৌবন।

সাতটা লোক খুন হয়ে গেছে।—

সিপার নিরুপায় আর নিরাশ হয়ে শেষ পর্যন্ত ভাবল আসলে ওরা সামাজিক মানুষদের শত্রু—ঘর সংসার ওদের নেই—তাই আজন্ম ভাসাকাঠ হয়ে সুখে শান্তিতে থাকা মানুষদের ছল চাতুরী, চুরি-চামারির দ্বারা ঠকিয়ে বাঁচতে চায়।···

ওদের বিশ্বাস করা যায় না, ওরা বিশ্বাসী হতেও চায় না।

ডানা মেলা প্রজাপতি

দুপুরে কোর্টে যাবার সময় মাঝপথ থেকে উঠতে হয় বলে ভিড় বাসের মধ্যে ভারী ব্যাগ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন গোবিন্দ মোক্তার। বিরাশী বছর বয়সের বুড়ো মানুষ হলেও কেউ সিট ছাড়ে না। দূরের যাত্রী প্রায় সবাই। সিট ছাড়াও খুব সোজা ব্যাপার নয়। সহানুভূতি দেখিয়ে কেউ হয়তো ব্যাগটা ধরতে নেয়। তারপর বলে, এত বয়সে আপনার কি না বেরুলেই নয় মিত্তির মশায় ?

গোবিন্দ মিত্তির উত্তর দেন, 'বাড়িতে তো থাকতে পারি না। আরো কষ্ট হয়।'

'মাথা ঘোরে না আপনার ?'

'না। রাত দুটো পর্যন্ত লেখা পড়ার কাজ করি। চশমা লাগে না এখনো। দাঁত সব ঠিক আছে।'

'প্রেসার দেখিয়েছেন।'

'হাঁা, সব ঠিক আছে।'

'ভাগ্যবান আপনি।'

'আমার চার ছেলে। বড়টা বি-এ বি এল, মেজো বি-কম, সেজো বি এস সি, ছোট এম-এ বিটি। পাঁচ মেয়ে পার করেছি। চারটির ছেলে মেয়ে অনেক। চার ছেলের ছেলে মেয়েরাও বড় হয়ে গেছে। শুধু ছোট মেয়েটা বিয়ের এক বছর পরেই বিধবা হয়ে গেল। সে ও বি-এ পাশ করেছে।

'আপনার এই ব্যাগের ভেতরে কি আছে, এত ভারী।'

'আলিপুর কোর্ট আছে ওঁর ব্যাগের ভেতরে।' একজন রসিকতা করল।

'তা আছে বাবা—পঞ্চাশটা কেস তো বটেই। কত মারামারি, জমি দখলের লড়াই, ঘর জ্বালানী কেস, চুরি, ডাকাতী, খুন, রাহাজানী।'

মালকোঁচা মেরে কাপড় পরা, খদ্দরের পাঞ্জাবী গায়ে, সারা মুখে তোবড়ানো ভাঁজ-অলা পাঁচ ফুটে পাতলা চেহারার ফর্সা বুড়োটিকে সবাই দেখে। পান চিবিয়ে মুখ লাল। মাথায় এখনো কিছু কালো চুল আছে।

মোমিনপুরে বাস এলেই মিত্তির বাবু নেমে চলে যান।

আবার সন্ধ্যার পরের গাড়ীতে তাঁকে ভাল সিট বাগিয়ে নিয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ফিরছেন দেখা যায় প্রতিদিন। সিট পাবার জন্যে তিরিশ পয়সা খরচ করে তিনি আউটরাম ঘাটে চলে যান—আবার ফিরে আসেন।

আজ যেন তাঁর শরীরটা কেমন করছে। কাঁঠাল খাইয়েছিল এক জন মক্কেল। বোধহয় হজম হয় নি। তারপর আর এক মক্কেল জামিন নিয়ে বেরিয়ে এসে হাতে ধরে কাঁদল। তার ভগ্নিপতিও ছুটো রাজভোগ খাওয়াল। চা তো চারটে ছটা আছেই।

মিত্তির গিন্নী গরম জল খাইয়ে দিলেন। গরম জল খেয়েই এত দিন বেঁচে আছেন গোবিন্দ মিত্র। এই তত্ত্বটি যদি জানত মানুষ তাহলে এত দুর্ভোগে পড়ত না—বলেন তিনি।

পা টিপতে থাকেন মিত্তির বুড়ী।

গোবিন্দ মোকতার ভাবেন, এবার তাঁর গিন্নী বোধ হয় কোনো আর্জি পেশ করবেন। হয় বৌমাদের বিরুদ্ধে, নয়তো ছোট মেয়েটির কি হবে সে সব কথা।

দোতলা দু খানা বাড়ি। পাঁচটা পুকুর। ছুটো গোলা। পঞ্চাশ বিঘে সম্পত্তি। কয়লা কেরোসিন দোকান করেছেন তিনি। বাপ মাত্র অড়াই বিঘে জমি রেখে মারা গেলেন। বিধবা মা দুধ বেচে ঘুঁটে বেচে ধান ভেনে তাঁকে মানুষ করলেন। এনট্রেন্স পাশ করতে পারলেন না। মোকতারীতে ঢুকলেন। তারপর টাকা আসতে লাগল।

স্ত্রী রাধারাণী বললেন, 'সুধার কি হবে হাঁ গো?'

'কি আর হবে?'

'বৃথা জীবন যাবে? ছোট সুকান্ত বলছিল, সুধার আবার বিয়ে দোব। একালে ওসব কিছু না।

সুধা মাস্টারী করতে যায়। ডেপুটেশনে আছে একটা কো-এডুকেশন স্কুলে।

রাধারাণী বলেন, 'আজ বিকেলে সুধার সঙ্গে এসেছিল একটা ছেলে। ছেলেটা বেশ দেখতে শুনতে।'

'খুব সাবধান। কুমারী মেয়েরই বিয়ে হচ্ছে না। বিধবা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড জিনিসের প্রতি যার লোভ তাকে দেখতে শুনতে ভাল হলেও সাবধান হতে হবে। যে অবস্থায় আছে তার চেয়ে আরো খারাপ অবস্থায় পড়ে যাবে।'

রাধারাণী বললেন, 'তা ঠিকই, তবু মেয়েটা কিভাবে থাকবে আমরা মরে গেলে। ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হয়ে যাবে। এখনি বউগুলো সবাই আলাদা খাবার চেষ্টা চালাচ্ছে। তাছাড়া ভরা যৌবন মেয়েটার। ওসব দমন করতে না পেরে যদি ভুলের ফাঁদে পা দেয়?'

'পুজো টুজো করতে বলো। ধর্ম-বিশ্বাস ত্যাগ করলেই মরবে। বাড়িতে রেডিও টেলিভিশন এসে আরো মুশকিল করেছে। বড়র মেয়ে ছবি, নাই বার করে কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে আমাকে বলে, 'দাদু আমি সিনেমায় নামব! —ওইসব দেখে আরো উতলা হয়। যৌবনে আমি কত কি করেছি—এখন আমার কাছে সাগরের মতো সব সোজা— ভাবতেও আজ লজ্জা হয়। মানুষের যৌবনকাল তো মাত্র দশ পনেরো বছর। এই সময়টা সংযত থাকলেই ভাবনা কেটে যায়।'

'তুমি সবই বোঝ কিন্তু আসলটাই বোঝ না। আর তোমাকে বোঝাতে যাওয়াই বোকামী।'

রাধারাণী চলে গেল।

রাত্রে আর কিছু খেলেন না গোবিন্দ মিত্তির। পাশের ঘরেই রাধারাণী আর ছোট মেয়ে সুধা থাকে। অনেক রাত পর্যন্ত তারা কিসব ভুটভাট করে কথা বলে।

বিধবা মেয়ের বিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র করছেন রাধারাণী।

স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিতে হবে সুধার। ও এখনও জানে না এর পরিণতি কত খারাপ হবে। যৌবন ভোগটা হয়ে গেলে মারধর করে জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবে। তখন ঐ ভাল ছেলেই সেরা বদমাস বলে প্রতিপন্ন হবে। এমন কেস এসেছে তাঁর হাতে অনেকগুলো।

সকালে উঠেই সুধাকে ডেকে বললেন, 'মা জননী, তুমি ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাকো, আর মাস্টারী করতে যেতে হবে না।'

বউগুলো সব হাসল। তার মানে তারা তাদের সেই হাসি দিয়ে জানাতে চাইল, ননদিনী তোমার ডুবে ডুবে জল খাওয়া ধরা পড়ে গেছে।

'তাই হবে বাবা।' বলে সুধা খিড়কির পুকুরের দিকে চলে গেল।

একা একমনে কিছুক্ষণ গন্ধরাজ ফুলে ভরা গাছটার নিচে বসে রইল।

বাবার আশঙ্কার কথাটা কিছুক্ষণ ভাবল সুধা। পরিমল তাকে ঠকাবে? দু'বছরের পরিচয়। শুভ্রাকেও দেখতে খারাপ নয়। বরং চেহারার দিক থেকে তার আকর্ষণ আর পাঁচটা ছেলের কাছে বেশিই। কিন্তু পরিমল ওর কথা বললে কিছু না বলে কেবল থুথু ফেলে।

পরিমল জানে সুধা বিধবা। পনেরো বছর বেলায় সে যখন ক্লাশ নাইনে পড়ে হঠাৎ বিয়ে হয়ে গেল। কথা ছিল দশম শ্রেণীর পাঠ সাঙ্গ হবার পর পতিগৃহে যাবে ঘরকন্না করতে।

কিন্তু জামাই অনুকুল মাঝে মাঝে আসত। কয়েক দিনের জন্যে একবার নিয়েও গিয়েছিল। অনুকুল চাইত সুধা পাশটা করুক। জীবনে কখনো যদি বিদপ আপদ আসে পরের বোঝা হতে হবে না তাকে।

পাশও করল সুধা। সে খবর পেয়ে দেড়শো টাকা দিয়ে একখানা শাড়ি কিনে দিয়ে গেল অনুকুল। তার মাত্র মাস খানেক পরে অনুকুল মারা গেল ঝড়ে গাছ চাপা পড়ে গিয়ে। অফিস থেকে ফেরার সময় ঝড় ওঠা সত্বেও সাইকেল করে দ্রুত পালিয়ে আসতে চেয়েছিল। মাইল খানেক পথ মাত্র বাস রাস্তা থেকে। কিন্তু প্রচণ্ড বেগে ঘূর্ণি ঝড়ের মধ্যে পড়ে সে বেশিদূর এগোতে পরেনি। তার মধ্যে বৃষ্টি নেমে কাঁচা রাস্তায় কাদা হয়ে গিয়েছিল। চাকায় কাদা জড়ানোর ফলে সাইকেলটাকে টেনে নিয়ে যেতে পারে নি। হঠাৎ বিরাট একখানা ডাল ভেঙে পড়ল শিরিষ গাছের। তারপর কতক্ষণ সে বেঁচেছিল সেই জানে। অনেক রাতে ঝড় বৃষ্টি থামার পর বাবুর বাগানে পথের ওপর ডালপালার নিচে সাইকেল সমেত মানুষ মরে পড়ে থাকতে দেখে কোনো পথিক। তার চেঁচামেচিতে লোক জন জুটল।···

ছোটদা বাসুদেব স্কুলে বেরুবার সময় সুধাকে ডেকে বলল, 'বাবার কথা শুনবি না। স্কুলে যাবি। একটা চাকরি পাওয়া যায় না, সাত তালি তেল পুড়ে যায়—মাস্টারী ছাড়বে। তুই স্কুলে যাবি।'

'বড়দারও মত নেই।'

উকিল লোক তো। মানুষের কোনো কাজ দেখে উকিল-দারোগা সবাইকে সন্দেহ করে। খারাপ দিকটাই বেশি করে ভাবে কিন্তু ভালোটাও তো আছে। কোনো কথা চলবে না। তুই স্কুলে যাবি, আর পরিমলের সঙ্গে আমি তোর বিয়ে দোব। তার জন্য যদি আলাদা হতে হয় হব। সংসার ছাড়তে হয় ছাড়ব।

কথাগুলো বড় বৌদিকে শুনিয়েই বলল বাসুদেব। তারপর সে বেরিয়ে গেল।

কিন্তু বাপের কথা অমান্য করতে চাইল না সুধা। তার ব্যাপার নিয়ে বুড়ো বাপ বা গোটা সংসার বিব্রত হোক এমন কাজ করতে সাহস হল না।

বিকেলে ফিরে যখন বাসুদেব শুনল সুধা স্কুলে যায় নি তখন সে ক্ষুণ্ণ হল। সুধাকে তলব করতে সে বলল. শরীরটা ভাল নেই ছোটদা।'

'আমাদের পুরুষ-শাসিত সমাজে মেয়েদের আর 'চরিত্র' বলে কিছু হল না রে সুধা। তোরা রঙিন কাঁচের মতো। বোঝাও যায় না।'

পর পর তিনদিন স্কুলে গেল না সুধা। বাবাও নিশ্চিন্ত।

গোবিন্দ মিত্তির নিজেই বক্তৃতা করতে থাকেন, 'আমার মা অল্প বয়েসে বিধবা হয়ে যে কষ্ট করেছে এখনকার মেয়েরা পারবে? মাকে ভোর বেলায় উঠে ধান সিদ্ধ করতে দেখতাম। ধান ভানত রাত দশটা পর্যন্ত। গরু ছিল চার পাঁচটা। সারাদিন কাজ পাগল হয়ে থাকত। বাজে ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার অবসরই থাকত না। আর আজ-কালকার মেয়েদের পোশাক পরতে, চুল বাঁধতে, সিনেমা দেখতে, 'নাটক নভেল পড়তেই সারাদিন চলে যায়। আর তাদের মনের মধ্যে যত পোকা কিলবিল করছে। নরকের কীট যত্তোসব।'

পরদিন বাবা পুকুরে স্নান করতে যেতেই বাসুদেবের সঙ্গে বেরিয়ে গেল সুধা। সুধা যে স্কুলে গেছে সে কথা আর কেউ জানাল না মিত্তির মশায়কে। তিনিও বহু পুরনো কালের তোবড়ানো কোঁচকানো ব্যাগটা ঝুলিয়ে নিয়ে দুপুর রোদে বেরিয়ে গেলেন আলিপুর কোর্টে।

স্কুলে আসতে পরিমল উৎকন্ঠিত হয়ে বলল, 'কি ব্যাপার, পরপর তিনদিন কামাই করলে যে?

সুধা বলল, 'মাইনে কড়ি মিটিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি। আর আসব না।

'কেন কি হল?'

'তুমি যাবার পর এ্যাকশান, রি-এ্যাকশান দুই ঘটেছে। বাবা বিরুদ্ধে। বড়দাও—শুধু ছোটদা পক্ষে।'

'বাবা কি বলছেন।'

'সে পরে বলব।'

'পরে বলার সুযোগ পাবে তো?'

'কি জানি।'

'তাহলে বলো না এখনি।'

'আমাদের এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলতে দেখলে বড় ছেলেমেয়েরা হাসবে, আর হেডমাস্টারও কড়া কথা শোনাবেন।'

'তবু একটু যদি বলতে।'

ঘণ্টা পড়ে গেছে। সুধা ক্লাস নিতে চলে গেল।

ছুটির পর পরিমল ধরল সুধাকে। খানিকটা দূরে চলে এলো তারা বাসে করে। ছোট উপশহর গড়ে উঠেছে আমতলায়। সেখানে নেমে একটা রেষ্টুরেণ্টে ঢুকে বসল দুজনে।

'বলো এবার।'

'বাবা বলতে চান, বাইরে তো এত কুমারী মেয়ের ছড়াছড়ি, তবে আর বিধবা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড মেয়েকে পরিমলবাবু বিয়ে করবেন কেন? এর ভেতরে উদ্দেশ্য আছে।'

'উদ্দেশ্যটা কি রকম।'

'উদ্দেশ্যটা হয়তো সাময়িক ভাবে যৌবনের মধু আহরণ। তারপর দুর্ভোগ ঘটবে।'

পরিমল চুপ করে বসে রইল। অন্যমনস্কভাবে সিগারেট টেনে টোকা মেরে তার ছাই ফেলতে লাগল।

সুধা বলল, 'তুমিই বা এতদিন বিয়ে করোনি কেন? বয়েস তো তোমার তিরিশ হয়ে গেছে।'

'ভাই বোনদের পড়াশুনো করাতেই তো সময় গেল। দুটো বোনের বিয়ে দিলাম। ভাইটা ডবলু বি সি এস পাশ করে বর্ধমান জেলার একটা ব্লকের বি ডি ও হয়েছে। মা তাগাদা লাগাচ্ছেন এবার বিয়ে করার জন্যে। মেয়ে আমদানিও করছেন এখান-ওখান থেকে।'

'তাদের কাউকে বিয়ে করে ফেলো।'

'তোমার কথা মাকে বলেছি।'

'আমি বিধবা সে কথা মাকে বলেছ কি?'

'না।'

'বলে দেখো, তিনি বিগড়ে যাবেন।'

'তোমাকে কেন যে ভালো লেগে গেল। এখন কি করব। কি করে বোঝাব যে আমি তোমাকে সাময়িকভাবে ভোগ করার জন্যে ভালবাসার অভিনয় করছি না। আচ্ছা সুধা, সে রকম কি মনে হয় তোমার? আমার চরিত্র যদি সে রকম হত তাহলে আমি আরো সব মেয়েদের সঙ্গে মিশতাম বা মেয়ে-ঘটিত ব্যাপারে আমার কিছু দুর্নাম থাকত। তুমি যদি আমাদের বাড়ি যাও তাহলে মেয়েদের কতকগুলো চিঠি দেখাতে পারি—যারা আমাকে প্রেমসহ নিজেদের নিবেদন করতে চায় কিন্তু আমি কারো চিঠির উত্তর দিইনি। উঞ্ছবৃত্তি আমার স্বভাবে নেই। কিন্তু যে যা চায় না বোধ হয় তার কপালে তাই জুটে যায় এটাই চরম নিয়তি। সেকসপীয়রের চরিত্রগুলোতেও সে-রকম দেখা যায়। যে দুর্নাম আমি চিরকাল এড়িয়ে ছিলাম সেটাই কপালে নেমে এলো। আমার জন্যে তোমাকেও নিন্দে মন্দ শুনতে হল।

সুধা বলল, 'মা আর ছোটদা আমার দিকে। ছোটদা হয়তো রিস্ক নেবে কিন্তু তোমার মাকে আগে জানিয়ে দেখ তিনি কি বলেন।'

'দেখব। যাও তাহলে আজ। দেরী করো না।'

'আচ্ছা' বলে সুধা চলে এলো।

গোবিন্দ মিত্তির সকালেই খবর পেয়ে গেলেন যে সুধা গতকাল

স্কুলে গিয়েছিল আর ফিরেছে সন্ধ্যার পর। তিনি সুধাকে ডেকে বললেন, 'তুই আমার কথা শুনবি, না বাড়ী ছাড়বি?'

সুধা কেবল রুষ্ট চোখে তাকাল।

রাধারাণী ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, 'মরণ বুড়োর! বুদ্ধি-সুদ্ধি খেয়েছে। বিধবা মেয়ের কোথায় গতি করবে না আরো চেপে ধরছে। ঐ মড়াটাকে ঘাটে বেঁধে রেখে কি পরে তোমার চিতায় তুলবে?'

বাসুদেব বলল, 'অত হৈ চৈ কিসের? বিধবার কি বিয়ে হচ্ছে না? পুরোনো গোঁড়ামি ছাড়ো তো। সুধা বি-এ পাশ করেছে, ও এখন স্বাধীন। ওর ভাল ওকে দেখতে দাও। আনুষ্ঠানিক বিয়েতে মিত্তির বাড়ির মার্যাদা যায় তো রেজেস্ট্রী ম্যারেজ করুক গে। আর স্কুলের চাকরি ছাড়বে না। বিরলাপুরের স্কুলে যে চান্স পেয়েছে, ওর বহুৎ কপাল।'

হাল ছেড়ে দিলেন গোবিন্দ মিত্তির। বললেন, 'যা খুশী করো তবে, আমাকে যেন শুনতে না হয়।

বড়দা বললেন, 'তোর বড়দা উকিল সেটা মনে রেখে ছোকরাটা যেন মিত্তির বাড়িতে নাক গলায়।'

কয়লা কেরোসিন ব্যবসায়ী দুই দাদা কিছুই বলল না। সুধাকে তারা যত দূর জানে তাতে তাদের বিশ্বাস, সে হঠাৎ মোহের বশে কোনো মন্দ কাজ করবে না।

সুধা প্রকাশ্যেই স্কুলে চলে গেল। গোবিন্দ মিত্তির তা দেখেও কিছু বলবেন না।

ভেতরে স্কুল, পরিমল ফ্যাক্টরি গেটের মুখেই সুধাকে আটকে বললে, চলো আমাদের বাড়িতে। আজ আর স্কুল করে কাজ নেই।

সুধা একটু ইতস্তত করল তারপর রাজি হয়ে গেল। রিক্সায় উঠে তারা আবার ফিরল পরিমলদের গ্রামের দিকে।

আধঘণ্টা পরে যে বাড়ির সামনে এসে হাজির হল সুধা, দেখে খুব অবাক লাগল তার। পুরোনো জমিদার বাড়ির মতো। মস্ত দর দালান, কাছারি বাড়ি, গোলা, গোয়াল, পুকুর বাগান। তবে সবই

যেন পরিত্যক্ত। ভেতরে বেশ খানিক আসার পর দুটি একটি মানুষের দেখা পেল সুধা। সিঁড়ি ভেঙ্গে দোতলা একটি ঘরে ঢুকে পরিমল বয়স্ক এক মহিলাকে দেখিয়ে বলল, 'ইনি আমার মা।'

প্রণাম করল সুধা।

'এসো মা বসো। থাক থাক প্রণাম করতে হবে না। কি নাম তোমার ?'

'সুধা মিত্র।'

'বাঃ! সার্থক নাম তোমার। বেল ফুলের মতো সাদা তুমি।'

পরিমল বলল. 'আমার সঙ্গে মাস্টারী করে। বাপের অবস্থা ভাল। শিক্ষিত পরিবার। তোমরা আলাপ করো। আসছি আমি।'

পরিমল সেই যে গেল আর এলো না।

তিনঘণ্টা কেটে গেল। পরিমলের মা পারিবারিক সমস্ত কথাই জানালেন। ঘরদোর দেখালেন। এমন একটা মেয়েই যেন তিনি খুঁজছিলেন খুব খুশি।

পরিমল এলো। মস্ত এক পোনা মাছ ধরে এনেছে। জেলেদের নিয়ে সে এতক্ষণ মাছ ধরাচ্ছিল।

রান্নার জন্যে আবার ব্যস্ত হলেন পরিমলের মা।

সুধাকে বাড়ি বাগান সব কিছু দেখাল পরিমল। সে বলল বাবা মারা যান যখন আমরা চার ভাইবোন সবাই ছোট। আমি মাত্র পনেরো বছরের—নাইনে পড়তাম। আমাদের বহু জমি ভাগচাষীরা দখল করে নিয়েছে। এই বাস্তু বাগানটা পঁচিশ বিঘে। ধান জমি মাত্র আছে আর বিঘে পনেরো। যাকগে, মাকে কেমন বুঝলে ?'

'খুব ভাল।'

'তোমার সব কথা বলেছ কি ?'

'না। এমনি সব সাধারণ কথা বলেছি। বাবা কি করেন, ক ভাই বোন, এইসব।'

অসময়ে আবার আহারাদি করতে হল। পরিমলের মায়ের হাতের রান্না যে এত ভাল হবে ভাবতে পারেনি সুধা। সব কিছুতে একটা

বনেদি ভাব। পুরোনো বড়লোক পরিমলরা।

আহারাদির পর পরিমলের মা সুধাকে নিয়ে একটু বসলেন। বললেন, এই তো মা আমাদের পোড়ো ঘরকন্না, তোমার ভাল লাগবে কি না জানি না।

'ভাল লাগবে মা! কিন্তু একটা কথা আপনাকে আমার জানানো দরকার। আমার আর একবার বিয়ে হয়েছিল।'

'তাই নাকি!' যেন সাপের গায়ে পা দিলেন পরিমলের মা।

পরিমল বলল, 'এক বছর পরেই বিধবা হয়ে যায়। ঘরকন্না হয়নি বলতে গেলে। ও তখন স্কুলের ছাত্রী। পাশ করার পর এক সপ্তা মাত্র গিয়েছিল স্বামীর ঘরে। তারপর ঝড়ে গাছ চাপা পড়ে ওর স্বামী মারা গেল। পরে পড়াশুনো করে বি-এ পাশ করে। এখন মাস্টারী করছে।'

'কি জানি বাবা, কার কপালে কি দুঃখ ঘটে।' পরিমলের মা সরে গেলেন।

সুধা আহত হল। বলল, 'আমি এবার যাই।'

পরিমল মায়ের কাছে গেল। বলল, 'মা, আমি অনেক মেয়ে দেখেছি কিন্তু—'

'ছিঃ। বিধবা মেয়েকে তোর পছন্দ হয়ে গেল? তোর মামার বাড়ি কলকাতায়। মামা কত চেষ্টা করল। কলকাতার আধুনিকা মেয়েদের তোর পছন্দ হল না? লোকে বলবে কি? আর কি রকম রুচি তোদের? এ রকম তো তুই ছিলি না পরিমল।

'মা, তুমি যখন যা বলো শুনেছি, কখনো অবাধ্য হইনি, এ ব্যাপারে তুমি যদি না মত দাও তবে অবাধ্য হতে বাধ্য হব।'

'পরিমল!' তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার করে উঠলেন পরিমলের মা গিরিজা বালা।—'তাহলে আমার মরা মুখ দেখবি।'

পরিমল বেরিয়ে এলো। সুধা চলে যাচ্ছে।

'শোনো সুধা, ধৈর্য ধরো। কথা দিচ্ছি, আমি বিয়ে করব না যত দিন না তোমাকে বিয়ে করতে পারি।'

সুধা কোনো মন্তব্য করল না।

সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার পর মাকে জানাল সব কথা।

বাসুদেবও সব শুনল। বলল, 'এক্ষেত্রে অপেক্ষা করা ছাড়া পথ নেই। মা বাবা যতদিন না গত হন ততদিন অপেক্ষা করো।'

পাঁচ বছর কেটে গেল গোবিন্দ মিত্র বা গিরজা বালা কারো গত হবার নাম নেই।

কিন্তু তাতে কি, ফ্রি লাইফেও এক রকমের সুখ আছে, ভাবে সুধা। ঘরকন্না আর না করাই ভাল।

চিরকালের প্রজাপতি হওয়া কি খারাপ।

পরিমলকে তাতে বরং বেশি করে পাওয়া গেছে। আর হারালেও দুঃখ নেই। শাঁখা চুড়ি ভেঙে কাঁদতে বসবে না। ওগো আমাকে কার ভরসায় রেখে গেলে গো বলে!

সাতাশী বছর বয়সে গোবিন্দ মিত্তির জগতের অনেক সমস্যার সমাধান খুঁজে পেয়েছেন কিন্তু নিজের যুবতী বিধবা মেয়ে সুধার জীবনের আধুনিক জীবন ভোগের পাপ থেকে কেমন করে উদ্ধার পাওয়া যায় ভেবে পান না।

পাপটা কি তবে তাদের মতো পুরোনো কালের লোকদের হাতে তৈরী একটা রহস্যময় গোঁজামিলের ফাঁদ। পাপ যে এখন প্রজাপতির মতো ডানা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছে, আধুনিক ওষুধ খেয়ে তার তো মরণ নেই!

আর মরণ নেই বলেই তো কলঙ্কের হাত থেকে বাবা মাও বেঁচেছেন।

সুধা একদিন প্রজাপতিটি সেজে-গুজে বেরিয়ে গেল দেখে গোবিন্দ মিত্তির বললেন, 'আই এ্যাম ওল্ড আই এ্যাম রিজেকটেড।'

রাধারাণী বললেন, 'বুড়োর ভীমরতি ধরেছে, এবার বোধ হয় মরবে। নাহলে মেয়েকে কেউ ইংরিজিতে গালাগাল দেয়!

কানাই সেখ ডাণ্ডা হাতে নিয়ে ছুটছিল তার বউ দরিয়ার পেছনে, ঠিক মোরগ যেমন করে মুরগীর পেছনে ছোটে।

গোটা পাড়াটাকে সাত বেড় করে ছোটার পরও কানাই দরিয়াকে ধরতে পারল না—সে যে কার ঘরে কোথায় লুকিয়ে পড়ল কানাই ঠিক করতে পারল না। সে চীৎকার করে আসফালন সহকারে গলাবাজি করছে, পচাল পাড়ছে। বলছে, 'মাগীকে এমন ফাটাব, যেন ঠ্যাং খোঁড়া হয়ে যায়। শালীর গতরে কি বাজ পড়েছে, খাবে আর নিদ মারবে। সকালের রসগুলো জ্বাল দেয়নি, তাড়ি ফুটে গেছে। ঢুপুরের রান্নাও হয়নি। গরুর খড় কুঁচোনো বাকি। ঘরদোর সব মাছি মুরগীতে 'ও লোল' করতেছে। ভাগ শালী—তোর মা এসেই তো কানে 'মন্তনা' দিয়ে গেছে, সে মেয়ে মানুষও কম বয়েসে বাঁঢ়ী হয়ে তেরিয়ে বেড়াচ্ছে। ওকে ঠ্যাঙাবার সময় যে বাধা দেবে তারও হাত গুঁড়ো করে দোব মুই। ধানচালগুলো 'দায়নাস্তি' করতেছে। ওর মা এলেই লুকিয়ে লুকিয়ে মুগকলাই, বরোজের পান, পটল, এটা সেটা বেঁধে দেবে—চালাকি পেয়েছে—ঠিক আছে, ও চলে যাক মায়ের বাড়ী, ওকে নিয়ে আর ঘর করবুনি মুই···

কানাই হাতের ডাণ্ডা নাচাতে নাচাতেই বাড়ির দিকে চলে গেল। পাড়ার ছেলেমেয়ে বউরা বেরিয়ে রগড় দেখছিল।

একটা বছর তেরো বয়সের মেয়ে বলল, 'হুঁঃ! যেন অবতার। তাড়ি খেয়ে মিনসে ভাম হয়েছে। বউকে রোজ ঠ্যাঙাবে, না পারলে ওর হাত 'লিসপিস' করে।'

জাহানারার মা শুধোলে, 'হাঁ গা, কোথায় লুকোল দরিয়া-বউ?'

একটা ছেলে বলল, 'সেই কলিমদ্দিনের ঘরে।'

'বাব্বা, সেখানে আর ঘেঁষতে হবে না। কলিমদ্দি 'কাটোয়া'র লোক। তেড়েল মাতাল—কতবার জেল—হাজত খেটেছে।'

'হাঁলা, কলিমদ্দির বউ ঘরে নেই যেলো, হাটে গেছে দেখনু তার পাগলি মেয়েটা আছে, কলিমদ্দি যদি কিছু করে ? বাঘের ভয়ে কুমীরের গর্তের ভেতরে ঢুকেছে যেয়ে। ঐ যদি জানে কানাই সেখ, তাহলে মেয়ে মানুষকে কেটে ফেলবে। তোরা যেন কেউ বলিসনি মা।'

ছেলেমেয়েরা কলিমদ্দির বাড়ির দিকে গিয়ে ভিড় করছিল। তাড়া করল কলিমদ্দি: 'কি র‍্যা সর, সাপের পাঁচ-পা দেখেছ ? ভাগ সব।'

লাঠি নিয়ে তাড়া করতে ছেলেমেয়েরা পালিয়ে গেল।

কলিমদ্দি পাগলি মেয়েকে বললে, 'ঐ বাঁশতলাটায় বাড়ী লিয়ে সব—যে এদিকে আসবে তাকে এক ঘা কষিয়ে দিবি।'

পাগলি মাথা নেড়ে ড্যাবা ড্যাবা চোখ বার করে বলল,—হুঁা তাই হবে। সে গিয়ে বাঁশতলায় চেপে বসল।

'ওগো দাদা, মোকে বাঁচাও গো—তোমার পায়ে ধরি'—বলে ঝড়ের বেগে ছুটে এসে পায়ের ওপরে আছড়ে পড়েছিল কানাই সেখের বউটা। তাকে ধরে নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে চাবি দিয়ে দিয়েছে কলিমদ্দি। তারপর লাঠি নিয়ে বসেছিল উঠোনে। বকুল গাছের ছায়ায় বসে আটল বুনছিল সে।

এখন দোরের চাবি খুলে ভেতরে গিয়ে আগল এঁটে দিল। ছোট্ট কুঁড়ে ঘরের মধ্যে অন্ধকার। পেছনের ঘুলঘুলি মতো জানলাটার ওপর থেকে তালপাতার চাটাইটা সরিয়ে দিতে বউটাকে দেখা গেল।

মেঝের এককোণে বসে আছে দরিয়া। কাঁদছে সে। বড় বড় গোল চোখে ভয়। হাঁপাচ্ছে এখনো। কলিমদ্দি কাছে গেল। হাত ধরল। বলল, 'এসো এখানে। ভয় কি ? বিছানায় বসো। আহা, এমন চেহারা, এই বউকে কেউ মারে ? কানাইটা একেবারে পশু জানোয়ার। পান, নারকোল, বাঁশ বেচা টাকার গরম হয়েছে। তোমার বাপ থাকত, মজা দেখাত। তোমার মাকে আমার কাছে আসতে বলো। দেখি ঢ্যামনা কেমন সোজা হয়নে।'

বিছানায় বসে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে দরিয়া বলল, 'আমি আর এখানে থাকব না। রোজ মারপিট করবে। বলে তুই খারাপ

মেয়ে। পান বেচতে শিয়ালদায় যায়, সেই রাতে নাকি মুই ঘরের মধ্যে লোক রাখি।'

'আসলে তোমার ছেলেমেয়ে হচ্ছে না, ও আর একটা বউ করতে চায়। শুনেছি সব—ধনরদ্দির মেয়েকে বে' করবে ··'

'করুক না, আমিও ওর বুকে লাথি মেরে চলে যাব। গত রাতে ঘরে হুড়কো মেরে শুয়েছিলুম বলে মিনসে সারা রাত বাইরে শুয়ে শুয়ে বিক্রম করেছে। দোরে কতবার লাথি মেরেছে—আমি দোর খুলিনি।'

কলিমদ্দি দরিয়ার চিবুকটা ধরে আদর করে শুধোলে, কেন, ওকে তোমার ভাল লাগে না ?

'না।'

আমার কাছে থাকবে ? আমার বউ হবে ?

তোমার তো বউ আছে।

'থাক না, গ্যাদার শরীরে তোমার মতন এমন নরম যৈবন কি আর আছে···

'ছি ছি, হাত ছাড়ো, একি করছ তুমি, না না ও জানলে আমাকে কেটে ফেলবে···

কিন্তু কলিমদ্দি নিজেকে সামলাতে পারল না।

দরিয়াকে চেপে শুইয়ে ফেলল। দেখল মেয়েটার শরীরে যৌবনের জোয়ার ভরা। রাজার ভোগ্যবস্তু নিয়ে চাঁড়ালের ঘরে পড়ে আছে দরিয়াজান।

দরিয়া আর বাধা দিয়েও যখন ঠেকাতে পারল না তখন সে কাঁদতে লাগল। কলিমদ্দি তার চোখ মুছিয়ে দিল। কলিমদ্দির মুখে ধেনো মদের গন্ধ। কিন্তু তা হোক—দরিয়া দেখল কানাইয়ের সঙ্গে এর আকাশপাতাল তফাৎ। বলিষ্ঠ পুরুষ কলিমদ্দি। মত্ত হাতীর মতো ও পিষে ফেলতে পারে। কানাই তার ওপরে অত্যাচার করুক, সে তা চায়ও বোধ হয় কিন্তু সে বেচারা তা বোঝে না, শুধু বাড়ি ধড়ি দিয়ে চাবকায়। দরিয়া কাজ না করে ওকে রাগিয়ে দেয়, ঘরে দোর দিয়ে

আছাড়কাছাড় করায় কিন্তু যখন ধরে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নিস্তেজ হয়ে যায়। তখন কামনায় ছটফট করে দরিয়া। তার শরীর শান্ত হয় না। মন তৃপ্ত হয় না। কলিমদ্দি কিন্তু যাদু জানে।···

দরিয়া যেন এক সময় তার হয়ে যায়। যে কথা বলে সে, হাঁ হয়ে যায়। কলিমদ্দির যে পাগল হবার উপক্রম। এমন রাজার ধন নিয়েও সে হাতছাড়া করে কি করে? তবুও সে এক সময় দরিয়াকে হাত ধরে টেনে ঘর থেকে বাইরে নিয়ে আসে। অন্য হাতে নেয় তলোয়ার।

দরিয়া চট করে ঘাটে যায় একবার। মুখে মাথায় জল দেয়। আঁচল দিয়ে মুছে ফেলে। পাগলি তাকিয়ে তাকিয়ে হাসে, বিড় বিড় করে আপন মনে কি যেন বলে সে।

দরিয়াকে হাত ধরে টানতে টানতে পথে আনে কলিমদ্দি। বলে, চলো তো দেখি, কানাই সেখ কত বড় বাপের বেটা হয়েছে—চলো তুমি। এসো—ভয় পাচ্ছ কেন?

দরিয়া চেঁচাতে থাকে, ওগো না গো, আমাকে মেরে কেটে ফেলবে গো—ওগো তোমার পায়ে ধরি গো···

পাড়ার মেয়েরা সবাই দেখতে লাগল।

কলিমদ্দি তাড়া দিল বউটিকে, 'এ মেয়েটাও দেখছি ভয়ানক অবাধ্য। চলো না তুমি, মেরে কেটে ফেলে কি দেখতিছি আমি।'

দরিয়া বউ তখন পিছনে পিছনে গেল। কলিমদ্দি গেল কানাই সেখের বাড়ি। কানাই তখন 'বান' জ্বেলে রস চড়িয়েছে। ধোঁয়ায় চারদিক ভরে গেছে। বাঁশ জটলা নুয়ে এসে টিনের চালের ওপরে পড়ে বাতাসে দোল খেয়ে শব্দ তুলছে।

এই যে কানাই মিয়া, বলি, বউকে নিয়ে ঘর করবার মতলব আছে তোমার? নাকি ধনরদ্দির মেয়েকে বে' করবে বলে গরিবের মেয়েটার ওপর অত্যেচার জুড়েছ?

কানাই সেখ কলিমদ্দির হাতে তলোয়ার দেখে তখন কাঁদতে শুরু করেছে। তবু ভরসা এনে বলে, ঘর সংসার করতে কি আমি দিই নি

ভাই ? ও কাজকাম করবে নে। চাষীর বাড়িতে আমি কি দাসী রাখতে যাব ?

যাও বসো তুমি, কাজকাম যা করতে হয় করো। বউটাকে বললে কলিমদ্দি। কানাইকে বললে, শালা পেঁচি মাতাল, দু'গেলাস তাড়ি প্যাটে পড়লেই বউকে ঠ্যাঙাস—কি বীরপুরুষ রে। আর কোনদিন মারলে তোর একটা রান ছেড়িয়ে লোব মুই। তিনবার জেল খেটেছি ফের একবার না হয় খাটব।

পাড়ার মেয়েরাও কানাইকে বোঝাতে লাগল, বউকেও দু-কথা শোনাল তারপর কলিমদ্দি চলে যেতে বউ কাজ করছে দেখে সবাই চলে গেল।

কানাই বানে জ্বাল ঠেলে দিয়ে এসে দাবায় বসে বসে বলতে লাগল, চিনির দর বেড়েছে বলে গুড়ের দাম হয়েছে খুব। রসটা তাড়ি হয়ে গেল, ঐ রসের গুড় চিটে হবে, তেতো হয়ে যাবে। শালী, মারেব ভয়ে তোর বাবার ঘরে যেয়ে আছরা লিয়ে ছিলি ?

দরিয়া ভাতেব হাঁড়ির তলায় আবার আগুন জ্বেলে জ্বালানী ঠেলে দিতে দিতে বললে, আমার বাবা হবে কেন, তোমার বাবা।

তুই কি রকম মেয়েমানুষ আমি বুঝি। আমাকে অপমান করতে চাস। ঠিক আছে, তোর মাকে খবর দে—তোকে আমি 'তাল্লাক' দোব।

'তাই দিয়ো।'

'ভাত ছড়ালে কাকের অভাব ?'

'কাকই আসবে, কাকাতুয়া আসবে না।'

ওরে ব্যাস, শালীর যে বাতেলা খুব! বলি, বাঘের ভয়ে কুমীরের গর্তে যেয়ে তো লুকুলি,—তোর আর রেখেছে কিছু তো ?

'না, তোমার মতন চেঁটে খেয়ে ফেলেছে। তুমি বাঘ না খ্যাঁক-শেয়াল ! নিজে যেমন, জগতের সবাইকে তাই ভাব।'

আয় শালী, তোকে দেখব। হাত ধরে জোর করে দরিয়াকে ঘরের মধ্যে টেনে আনল কানাই। দরিয়া হাত ছাড়াল, ঝটাপটি করল, গাল

দিতে লাগল কিন্তু কানাই তাকে টেনে আনলই।

মেঝের ওপরে তাকে পেড়ে ফেলে কাপড় খুলে তন্ন-তন্ন করে দেখল। গন্ধ শুকল।

দরিয়ার চোখে তখন সাপিনীর দৃষ্টি।

দরিয়া ফরসা মেয়ে। লালচে আঁচড়ের দাগ ওর তুঙ্গ বুকে।

একটা গন্ধ কানাইকে পাগল করে দিল। বলল, হায় আমার কপাল। তুই শালী, সর্বনাশ করে এসেছিস!

ধ্যেৎ! মিনসে যেন অবতার! ছিটকে উঠে পড়ে চলে এলো দরিয়া। উনুনের ধারে বসে বিকৃত স্বরে বলতে লাগল, গন্ধ! গন্ধ! কিসের গন্ধ?

মন ভারী করে হেঁসোটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেল কানাই। দুপুরে যদিও সে তাল গাছ কেটে ফিরেছিল, আবার চলে গেল। পান বোরোজের ভেতরে বসে ছাঁদলায় ঝোলা বড় দুটো শশা তুলে ছাড়িয়ে খেতে লাগল। পান গুছোনো ছোট্ট কুড়েটার মধ্যে এসে ধুলোয় গামছা পেতে শুয়ে রইল। চান করল না, খেলও না।

এক সময় দরিয়া এলো। কাছে বসল। গায়ে হাত দিয়ে ঠেলা দিতে লাগল। গা ধোবে, ভাত খাবে চলো না—বিকেল হয়ে গেল যে। উঠলে তবু। ওঠো, তোমার পায়ে ধরি, আর কোনদিন তোমার অবাধ্য হব না। ওঠো. আমার আর খিদে সহ্য হচ্ছে না। উঠলে তবু…

'না, তুই চলে যা। যা কলিমদ্দির কাছে যা।'

তুমি বিশ্বাস করো, মাথায় হাত দিয়ে 'দেলেসা' করতিছি মুই।

'চোপ শালী! তোর বুকে অত আঁচড়ের দাগ কেন?'

'দূর হও মিনসে! তাড়া করতে নহীদের ঘরের পেছনে কঞ্চির বোঝার ওপর পড়ে গেলুমনি! উঃ! যা লেগেছে!'

কানাই সেখ উঠে বসল: স্ত্রীর চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। অবুঝ ভাষাটা প্রাকৃতিক জ্ঞানের সাহায্যে পড়তে চেষ্টা করল। কিন্তু পড়তে পারল না।

তখন কানাইয়ের হাত ধরে নিজের পেটটাতে বুলিয়ে দেখিয়ে বলে

দরিয়া, 'দেখ তো, কিরকম ভুখ লেগেছে।'

কানাই দেখে ওর খোলা বুক, নধর পেট, পুরুষ্ট ঠোঁট, গোল গোল মায়া ভরা চোখ, এক মাথা চুল ভেঙে পড়েছে।

দরিয়ার সব অপরাধ যেন ভুলে গেল কানাই। হঠাৎ তাকে বুকে টেনে নিয়ে হাউ মাউ করে কাঁদতে লাগল। বলতে লাগল, 'ওরে বউ ওরে আমার দরিয়া, তোকে ছেড়ে যে আমি থাকতে পারবুনি।'

'কেঁদো না ছি, কেউ শুনতে পাবে। চলো গা ধুয়ে ভাত খাবে চলো।'

'তুই কথা দে, কলিমদ্দির কাছে যাবিনি। তার সঙ্গে কথা বলবিনি।'

না। এই মাথায় হাত দিয়ে 'কিরে' খাচ্ছি।

কানাই সেখ দরিয়াকে ধরে হাজার গণ্ডা চুমো খেল। তারপর স্নান করে এসে খেয়ে নিয়ে ঘরের তক্তাপোষে শুয়ে পড়ল।

দরিয়াও স্নান করে খেয়ে এসে স্বামীর পাশে শুলো কিছুক্ষণ।

তার সন্তান হবে কিনা ভাবতে লাগল।

বিকালে সে ঘুমিয়েছিল। কানাই আর ডাকল না। নিজের কাজে চলে গেল। সে ঠিক করেছে দরিয়াকে আর মারবে না। একটা মেয়েকে দিয়ে কাজ করাবে। ভাগচাষ করে আর নিজের জমিতে যা ধান ফসল হয় তাতে তো চলে যায়ই—উপরন্তু বছরে হাজার চারেক টাকা জমে। সেই টাকাতে জমি কেনে।

দশ বছর হল বিয়ে হয়েছে, এখনো তাদের সন্তানাদি হল না। দরিয়ার বড় বাচ্চার সাধ! কত মেয়ের কত বেশী বেশী বাচ্চা হচ্ছে বলে তাদের পুরুষরা অপারেশন করে আসছে। দরিয়া বলে, 'তুমি বাঁজা!'

কানাই বলে, 'তুমিই বাঁজা। আচ্ছা, আমি আর একটা বে' করব, দেখি ছেলেমেয়ে হয় কিনা।'

'না, তুমি বে' করতে পারবে না। তাহলে আমি গলায় দড়ি দোব!'

কিন্তু যে রাত্রে কানাই পান নিয়ে গেল, মাঝ রাতে, বন্ধ

দোরে কলিমদ্দি এসে আঘাত করে ডাকল, 'দরিয়া বউ জেগে আছ।'

দরিয়া যেন মড়ার মতন হয়ে যায়। সাড়া দেয় না। সে স্বামীর মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি করেছে। তাছাড়া সে যদি বাঁজা হয়ই তবে আর পাপ কাজ করে লাভ কি।

কিন্তু কলিমদ্দির জান্তব বীর্যবত্তার মধ্যে প্রচণ্ড রকমের একটা সুখ আছে, তৃপ্তি আছে। আর যদি কানাই হঠাৎ এসে পড়ে? তাকে সন্দেহ করেছে। পানগুলো কাউকে পাইকারী দরে বেচে দিয়ে এসে আড়ালে লুকিয়ে থাকতে পারে। সে দোর খুলে দিলে ঢুকে পড়ে কাকে কেটে ফেলবে তার ঠিক নেই।

দরিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হল। বলল, 'তুমি কেন এসেছ? চলে যাও, নইলে আমি চেঁচাব! তুমি খুব মন্দ লোক। তোমার ঘরে 'আছরা' লিতে তুমি আমার বেইজ্জত করলে। তুমি কি লোক ভাল?

'আচ্ছা এই তো?'

'হ্যাঁ।'

'খোলো বলছি দোর, লাথি মেরে ভেঙে ফেলব।'

'তোমার পায়ে ধরি, চলে যাও, ও এক্ষুণি ফিরবে—লোক আনবে, তোমাকে কেটে ফেলবে, আমাকে 'সন্দো' করে। হয়তো চর দিয়ে আছে, যেই ঘরে ঢুকবে, এমনি ঝাঁপিয়ে পড়বে।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

আবার ডাকল কলিমদ্দি। কি দিয়ে যেন দোরটা খোলার চেষ্টা করছে। তখন দরিয়া চেঁচাতে শুরু করল, 'ওগো, তোমরা ওঠো না গো, চোর পড়েছে গো···ও নবীর বাপ, ও সেরালি।'

'আচ্ছা মেয়েমানুষ তো!' কলিমদ্দি তখন দাবা থেকে লাফ দিয়ে আঙুলের ডগায় ভর করে ছুটে পালিয়ে গেল।

পাড়ার লোকেরা উঠে পড়ে লাঠি নিয়ে ছুটে এলো। চারদিকে আলো নিয়ে দেখতে লাগল।

দরিয়া দোর খুলে বেরিয়ে এসে বলতে লাগল কেমন করে দোর খোলার চেষ্টা করছিল। ভয়ে হাত-পা ঠক ঠক করে কাঁপছিল।

কানাই সেখও এসে পড়ল তখন। সঙ্গে তার তিনজন লোক। সবাই মদ খেয়েছে। কানাইও। পাড়ার লোকজন চলে গেল।

কানাই বলল, এ আর কে হবে, বুঝতেই পারছি। শালা, তোদের জন্যেই দেরি হয়ে গেল! মাল খাওয়া আর তোদের শেষ হল না সময় মতন।

কলিমদ্দি আড়াল থেকে একবার দেখে গেল কারা কারা কানাইয়ের সঙ্গে এসেছে। সোনাপুরের রাধানাথ, করিম আর নগেন গুণ্ডা।

ভারি ভাগ্য আজ কলিমদ্দি প্রাণে বেঁচে গেছে।

নারী বড় ছলনাময়ী! দরিয়ার দিকে আর সে চোখ ফেলবে না। থুঃ!

কানাই তিনজনকে বিদায় দিয়ে এসে দরিয়াকে তেলেভাজার ঠোঙা দিল। তারপর তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে বিছানায় ফেলে দিল। বলল, 'তুই যে ভাল আছিস আজ বুঝতে পারলুম মুই!'

'তবে, সন্দো করতে!' সাপিনীর চোখে হাসল দরিয়া।

মাস তিনেক পরে দরিয়া জানতে পারল সে মা হতে চলেছে। সংবাদটা পেয়েই তো কানাই কোমরে হাত দিয়ে নাচ জুড়ে দিল।

দরিয়া হাসতে হাসতে লজ্জায় মুখ লুকোল। স্বামীর তাড়া খেয়ে কলিমদ্দির ঘরে গিয়ে লুকোনোর পরের দৃশ্যটা সে কিছুতেই মন থেকে সরাতে পারে না। পারবেও না হয়তো কোনোদিন।

কিন্তু সে কথা তো আর কানাইকে বলা যায় না। সব কথা পুরুষদের জানাতে নেই। জানালে সংসার লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়।

চৌচাকলা জায়গা এক বিঘে সাত কাঠা। আগে উলুমাঠ ছিল। বাস-চলা পাকা রাস্তার ধারেই জায়গাটা। মালিক বিনোদ রায় গ্রামের অভাবে-পড়া মধ্যবিত্ত মানুষ হলেও মেয়ের বিয়ের সময় বেচে দিলে তিন হাজার হিসাবে। দোকান-পাট গজিয়ে-ওঠা মোড়ের মাথার জায়গা হলে বিশ হাজার টাকা বিঘে এখন কলকাতার দক্ষিণ পশ্চিমে বিশ ত্রিশ মাইল দূরের গ্রামগুলোতেও। বাজার-গ্রাম-গঞ্জে ইলেকট্রিক এসে গেছে। লেদ মেশিন, ব্রাশ কারখানা, আইসক্রীম কল, প্রেস, স্পিনিং গজিয়ে উঠছে। কলকাতার বাস চলছে মাইল খানেক দূর দিয়ে নানান রুটে। আশী বছর বেঁচে থেকে খালি পায়ে, খালি গায়ে, বাজারে গুড়ের কলসী বয়ে. কোদাল পেড়ে, ছেলেমেয়ে মানুষ করে গ্রামের মধ্যেই মরে যাওয়ার দিন চলে গেছে এইসব গ্রাম থেকে। প্রতিদিন প্রতি বাসেই এখন শহরে চলেছে গ্রামের মানুষরা নানান কাজ-কারবারে।

দলিল-পত্র করে সাড়ে চার হাজার টাকায় উলুমাঠটা বেচার পর বিনোদ রায়ই জনটন লাগিয়ে উলু কাটিয়ে ডাঙা পরিষ্কার করে দিলে। দুশো টাকার উলু-কাশ বিক্রি হল। চারদিকে পাঁচিল দেবার পর বিনোদ রায় বললে সুপারি আর নারকেল চারা বসিয়ে দিন সাহেব।

তাই করা হল।

তিনভাগ জমি সামনে রেখে মাঝ দিয়ে একটা পথ তৈরী করে বাড়ি বানানো হল তিন কামরার আধুনিক ডিজাইনে। পঞ্চাশ হাজার খরচ হয়ে গেল। আজ বাগানবাড়িটা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। সবুজ দূর্বার কার্পেট দুদিকে। পথের দুধার দিয়ে গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া, গাঁদা ফুলের গাছ। বাড়ির সামনেও নানান ফুলের মেলা। লোহার গেটের সামনে বোগেনভিলার অজস্র ফুল আর দুটো সুন্দর

ঝাউগাছ বেড়ে উঠছে। চার বছরের মধ্যে ইউক্যালিপটাস গাছ চারটেও বেশ বেড়ে উঠল।

শীতের সকালে লনের ঘাসের ওপরে ইজিচেয়ার পেতে বসে বিদেশী একটা উপন্যাস পড়ছিলেন নিশার চৌধুরী। অনেক রাত জেগে পড়েও বইটা শেষ হয়নি। অনেক বই এনেছেন কলকাতা থেকে।

বাগানের মালী যুধিষ্ঠির গায়েন ফুল গাছের পরিচর্যা করছে। লোকটার আগে নার্শারী ছিল। সে সব উড়ে-পুড়ে গেছে দেনা আর মামলায়। বউটাই নাকি ওর সব নষ্টের মূল।

নিশার চৌধুরী ছেচল্লিশ বছর বয়সে বিরাট জুতোর কারখানার ডিপার্টমেন্টাল ম্যানেজারী ছেড়ে 'ফুটফর্ম' নাম দিয়ে একটা কারখানা খোলার পর ছেলের দক্ষতার ওপর সেটার ভার অর্পণ করে নিশ্চিন্তে এই বাগানবাড়িতে কয়েকদিন কাটাতে পারেন। ছেলে আসিফ বি-কম পাস করার পর জুতোর নানা রকম ফর্ম আঁকতে, কাঠ কেটে তার অবয়র তৈরি করার কাজে ওস্তাদ কারিগর হয়ে গেছে। ভেবেছিলেন তাঁর প্রাক্তন কারখানার মূল ম্যানেজার চেক সাহেবকে বলে আসিফকে ওখানেই কাজে লাগাবেন। কিন্তু ছেলে তাঁর কাঁধের বোঝা কেড়ে নিল। নানান দেশ থেকে এখন তাঁর কারখানায় মালের অর্ডার আসে। বড় ইংরেজি দৈনিকে তাঁর কারখানার বিজ্ঞাপন থাকে। অনেক জুতোর প্রতিষ্ঠান অর্ডার দিয়ে মাল তৈরি করিয়ে নিচ্ছে। ব্যবসা জমজমাট। শতখানেক লোক কাজ করে। ইউনিয়ন গড়েছে। দামকড়ি-বোনাস ইত্যাদির ব্যাপারে তারা বেশ উৎসাহী। উৎপাদন বাড়ানোর ব্যাপারে ততটা নয়। অথচ প্রত্যেকটি লোক যখন কাজ চেয়ে পায়ে হাতে ধরে কান্নাকাটি করেছিল তখনকার সেই দুর্দশার কথা আজ বেমালুম ভুলে গেছে। অন্যমনস্ক হয়ে গিয়ে ভাবছিলেন চৌধুরী সাহেব।

রাবেয়া বাজার নিয়ে এলো। খবরের কাগজটা দেবার সময় বললে, 'কি ভিড় বাবু, যেমনি বাজারে ভিড়, তেমনি গাড়িতে। মেয়েদের নামতে উঠতে দেয় না। জোর করে চেপে ধরে।'

'কি মাছ আনলে ?'

'ট্যাংরা আর ভেক্‌টি—সতেরো টাকা কিলো—বাজারে আগুন ধরে গেছে। ফুলকপি, টম্যাটো, গাজর, সিম, লাউ এনেছি। আপনাকে চিড়ে-দই আর সন্দেশ দিচ্ছি।'

রাবেয়া ভেতরে চলে গেল।

······রাশিয়ার তুর্কমেনিস্তানের সুলতান কেমন করে তাঁর সৈন্য-সামন্ত দিয়ে অত্যাচার করতেন। এক যুবতী স্বামী-হারা হল একটি মাত্র শিশু কন্যাকে নিয়ে। যুবতীটি সুন্দরী, তাকে কাজ দেবার অছিলায় ষড়যন্ত্র করে সুলতানের হারেমে পেঁ ছে দেবার জন্যে কয়েক-জন অশ্বারোহীর কথাবার্তায় যখন মেয়েটি বুঝল যে তাকে নিয়ে গিয়ে এরা ফ্যাঁসাদে ফেলতে চায় তখন সে মরিয়া হয়ে ঘোড়া ছোটাল। ধাবমান শত্রু-সেনাদের সামনে প্রচণ্ড জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে যাবার সময় পাহাড়ের গায় লেগে সে ছিটকে পড়ল।

এবার তার বাচ্চাটির কাহিনী। রুশ-বিপ্লবের পরবর্তী সময়······

বই বন্ধ করলেন নিশার চৌধুরী। অত্যাচারী সুলতানের আর হতভাগা মেয়েটির কথা ভাবতে ভাবতে ঘুরে ঘুরে তিনি বাগানটা দেখতে লাগলেন। গোলাপের কুঁড়িগুলো শিশির মেখে রৌদ্রস্নান করছে। পেছনের বাগানে কুড়ি-সাবি আলু-গাছ সবুজ হয়ে উঠেছে। বীট আর বেগুন আছে, খানিকটা জায়গায় মটরশুঁটির গাছ উদ্দাম হয়ে উঠেছে।

ছোট্ট পুকুরটাতে পোনার চারা ফেলা হয়েছে। কিছু কুঁড়ো ছড়িয়ে দেবার পর ঘাটের কাছে মাছগুলো খাবার পেয়ে ছুটোছুটি করতে থাকে। চেলা মাছগুলো সবচেয়ে বেশি দুষ্টু।

ফোনের জন্য দরখাস্ত করা আছে দু বছর হয়ে গেল, তবু পাওয়া গেল না। কারখানার খবরাখবর রাখায় অসুবিধা হচ্ছে।

রাবেয়া খেতে ডাকল।

ভেতরে এসে উঠোনে মোড়া পেতে বসলেন নিশার চৌধুরী। খেতে খেতে খবরের কাগজখানা খুললেন।

চীনের বিপ্লবী কর্তারা এখন ভাবছেন উৎপাদনের ওপরে শ্রমিকদের মাইনে-কড়ির ব্যবস্থা হবে···সতেরো কোটি মানুষের নির্বীজকরণ করেছে চীনদেশ······

রাবেয়া কুটনো কুটতে কুটতে বলল, যুধিষ্ঠিরের বউয়ের সঙ্গে দেখা। অনেক কথা বলতে চাইল—'ঐ তো মামলা বাধিয়েছিল আত্মীয় স্বজন-দের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দিয়ে। আমি আমল দিলাম না। কোলে একটা বাচ্চা আছে। ময়লা কাপড়। বাজারের মেয়ে! এখন আবার ঘরকন্না করতে চায়। যুধিষ্ঠিরকে বললেই সে কাস্তে দেখায়।'

চৌধুরী সাহেব বললেন 'এখানে ঘেঁষতে দেবে না। তোমার সঙ্গে যে হতভাগাটার বিয়ে হয়েছিল সেটা কোথায়?'

রাবেয়া বলল, 'সে নেশা করে, মস্তানী করে, লোকের মার খায়, পুলিস ধরে নিয়ে গিয়ে আচ্ছা করে দোরস্ত করে। গতকাল আমার মেয়েটাকে চুরি করে নিয়ে পালাতে এসেছিল—আমার বাপ গাছ-কাটারী নিয়ে তাড়া করতে পালিয়ে গেছে। কোর্ট থেকে তালাক নেওয়া সত্ত্বেও এখনো দাবি করে আমি নাকি এখনো ওর বউ আছি। ও নিজের মুখে তিন তালাক না-দিলে নাকি তালাক হবে না। মাতাল, বদমাইস আবার শরিয়তের ফতোয়া দেয়।'

—কোনোদিন যদি তোমার হাত ধরে টেনে নিয়ে যায়?

—চেঁচাব, কামড়ে ছিঁড়ে দোব। উঃ! আগে কত মেরেছে, গতর থেঁতো করে দিয়েছে!

—তা তোমাদের বনিবনাও হল না কেন?

—ওর অনেক দোষ। নেশা করবে আর নানান মেয়ের সঙ্গে 'আস্‌নাই' করে বেড়াবে।

—তাহলে তোমার কাছে বোধহয় ও শাস্তি পেত না।

—ওর শাস্তিতে আর শেষ নেই বাবু।

—তোমার আবার বিয়ে করা উচিত, কতই বা বয়স—কুড়ি-বাইশ হবে?

—ষোলোয় পড়ে বিয়ে হল। সতেরো থেকে তিন বছর আজ

ছাড়-ছিড়েন হয়ে গেছে। কুড়ি বছর বয়স এখন আমার।

—আমার এখানে কাজ করো, কেউ কিছু বলে না?

—কে জানে, কে কি বলে না বলে আমি অতো তোয়াক্কা করি না!

—ভাল কথা, তোমার মেয়েটার জন্যে আর তোমার যুধিষ্ঠিরের জন্যে জামা কাপড় এনেছিলাম যে……

চৌধুরী সাহেব উঠে ভেতরে গিয়ে একটা প্যাকেট এনে খুলে ফেলে দেখালেন কাপড়গুলো।

বললেন, 'এটা তোমার মেয়ের লাল গরম জামা। এটা প্যাণ্ট। এই একটা গরম টুপি। এটা তোমার শাড়ি। এই একখানা চাদর। এই জামাটা তোমার গায়ে হয় কি না দেখো। যুধিষ্ঠিরকে ডেকে এই ধুতি আর জামা-চাদরটা দিয়ে দাও।'

রাবেয়া খুব খুশী। তার আর তার মেয়ের জামা নাকি গায়ে ঠিকই হবে। এক প্যাকেট চকোলেটও ওর বাচ্চাটার জন্যে দিলেন চৌধুরী সাহেব। বললেন, 'একটু গরম পানি করে দাও, আমি গোসল করব।'

জামা কাপড় খুলে রোদে তেল মাখতে বসলেন তিনি। সুন্দর সুডোল চেহারা তার। কে বলবে যে তার বয়স ছেচল্লিশ পার হয়ে গেছে? তরুণ জোয়ান চেহারা। ফরসা ধব্‌ধবে রং। মাথার চুল-গুলোর মধ্যে দুটো একটা পাক ধরেছে। দাড়ি এবং জুলপিতেও চুল পাকছে।

রাবেয়া বাবুর চেহারা দেখে ভাবে এমন তরতাজা মানুষটা আজ বিশ বছর নাকি একা একা কাটাচ্ছেন। উনিই একদিন বলেছিলেন, 'বউ-ছেলেকে নিয়ে গিয়েছিলাম বিলেতে কোম্পানীর কাজ শিখতে। সেখানে গিয়ে হঠাৎ নিউমোনিয়া হয়ে বউ মারা গেল। ছেলেটা মা-হারা হয়ে মাস দুয়েক খুব কাঁদল তারপর বোধহয় ভুলে গেল। পাঁচ বছরের সেই ছেলে আজ পঁচিশ বছরের হয়ে গেল।'

জল গরম করে দেবার পর বাথরুমের মধ্যে গিয়ে স্নান করে নিলেন চৌধুরী সাহেব।

ফুলবাগানের মধ্যে আবার উপন্যাসখানা নিয়ে বসলেন তিনি। পৃথিবীর কত ভাষার কত বই যে পড়লেন, যে সব বইয়ে সে দেশের মানুষের জীবনযাত্রার খুঁটিনাটি বিবরণ আর প্রকৃতির ছবি আঁকা হয় তা তাঁর বেশ ভাল লাগে। এই বইটির মধ্যে আছে পার্বত্য এলাকার লোকদের চরমতম খাদ্যের অভাবের কথা। পার্বত্যভূমি থেকে উদ্ধার করা এক বকমের কন্দমূল আর বাজে জাতের কলাই মানুষদের খাদ্য। খাদ্য ব্যবসায়ী গ্রামেব মোড়লরা অনেক দামে জিনিস বেচে আবার সুদ খাটায়। একটি গরু জাবর কাটে রাত দিন খালি মুখে ক্ষিদে ভুলে থাকার জন্যে—তার দাঁতগুলো ঘর্ষণের ফলে ক্ষয় হতে হতে শেষ হয়ে গেছে ··

···যুবতী মেয়েটি সুলতানের চক্রান্তে ধরা না দিয়ে মারা যাবাব পর মস্কোর এক কমিউনিস্ট কর্মী এলেন এই অঞ্চলে। গরীব চাষীদের মধ্যে ঐক্য আনলেন। ডিনামাইট দিয়ে পাহাড় ভেঙে নদীর ধারা আনলেন। জমি তৈরী করে চাষ হল। মহাজনকে মেবে ফেলল সবাই। তারপর এলো রুশ সৈন্যরা। রক্ষণশীল সুলতান আর জমিদারদের সঙ্গে তাদের লড়াই চলতে লাগল। শিশু কন্যাটিকে রুশরা নিয়ে গেল। সে লেখাপড়া শিখে মানুষ হতে লাগল···

রাবেয়া খেতে ডাকল, রান্না শেষ হয়ে গেছে নাকি তার।

টেবিল-চেয়ারে খানা খাওয়ার অভ্যাস চৌধুরী সাহেবের। রাবেয়া দেখল বাবু আজ অন্যমনস্ক। নিজেই এটা সেটা পাতে তুলে দিয়ে খাওয়াতে লাগল।

—ভেকুটি মাছ রান্নাটা কেমন হয়েছে বাবু?

—হাঁ, বেশ চমৎকার। ট্যাংরা মাছের ঝালটাও বেশ রেঁধেছ। তুমি এত গুণী মেয়ে কিন্তু তোমার এমন কপাল যে কেন হল তাই ভাবি।

—আমার জন্য আর ভাববেন না বাবু। এই তো বছর তিনেক হল একলা আছি। কিন্তু আপনি টাকা-পয়সা বিষয়-সম্পত্তির মালিক হয়েও সুস্থ সবল শরীরে আজ বিশ বছর একা একা কাটাচ্ছেন,

ভাবতেও অবাক লাগে !

—চাকরি আর ছেলেটাকে মানুষ করা নিয়ে কাটল বেশ কটা বছর। চাকরি ছাড়ার পর একটা কারখানা গড়লাম। এখন আমার বিশ্রাম। শুধু ছেলের বিয়েটা দিলেই দায় থেকে খালাস।'

রাবেয়া নাকি ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছিল। ওর বিয়ে হল স্কুল-ফাইন্যাল ফেল করা ছেলের সঙ্গে। কোথাও কিছু চাকরি না পেয়ে শেষ পর্যন্ত কামারশালায় নাট-বোল্টু তৈরি করার কাজে লেগেছিল। প্রচণ্ড দৈহিক পরিশ্রম করতে হয় লোহার ডাণ্ডা ঘোরাবার সময়। ঐ কারখানা থেকেই নেশা করার অভ্যাস। মালিককে একদিন মারল। সে থানায় ডায়েরী করল। ওকে ধরে নিয়ে গিয়ে পুলিসে পেটাল। মুচলেকা দেবার পর খালাস পেল কিন্তু কাজটা গেল।

রাবেয়ার বাবা প্রাইমারী স্কুলের মাস্টার। বুড়ো মানুষ। কিন্তু এখনো কাঠ কাটেন, মাছ ধরেন, খুব পরিশ্রম করতে পারেন। আরো দুটো মেয়ে আছে, তিনটে ছেলে। তারা ছোট ছোট। মাত্র বিঘে দুই ধানজমি আর দশ কাঠা বাস্তুভিটে নিয়ে টিকে আছেন।

যুধিষ্ঠিরকে খাইয়ে দেবার পর রাবেয়া তার খাবার বেঁধে নিয়ে বাড়িতে চলে গেল।

কম্বল মুড়ি দিয়ে বই পড়তে পড়তে একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন চৌধুরী সাহেব।

কলিং বেল বাজতে উঠে বসলেন।

বাইরে এসে দেখলেন তিনটি কুমারী মেয়ে এসেছে তাঁর কাছে স্থানীয় কলেজের সাংস্কৃতিক উৎসবের জন্য কিছু দান-খয়রাত আদায় করতে।

ঘরভরা বইপত্র দেখে একটি মেয়ে বলল, 'কত বই! আপনি একাই পড়েন! আমাদের পড়তে দেবেন ?'

—উঁহু, এখানে বসে পড়ে যেতে পার। তোমার নাম কি ?

—আমার নাম বিউটি, পোষাকী নাম মিনু মমতাজ। এর নাম রূপশ্রী, আর এ হল ছন্দা। তিনজনেই আমরা পার্ট টু ফাইন্যাল

দিচ্ছি।

ছন্দা বলল, 'আপনার এই বাগান বাড়িটি বড় চমৎকার। যেন ছবির মতো হাসছে।'

দশটা টাকা দিতে ওরা খুব কৃতজ্ঞতা জানিয়ে চলে গেল। যাবার সময় তিনজনে তিনটি গোলাপের কুঁড়ি ছিঁড়ল। জানলা দিয়ে চৌধুরী সাহেবকে দেখতে পেয়ে চোর-দায়ে ধরা-পড়ে পরস্পরের গায়ে ধাক্কাধাক্কি করে হাসতে হাসতে পালিয়ে গেল।

সন্ধ্যার সময় নতুন শাড়ি ব্লাউজ পরে রাবেয়া আবার এলো। রাত্রে সে এখানে থাকে না। সন্ধ্যায় রান্না করতেও হয় না। দুধ ফল বা বিস্কুট পাউরুটি যা-হোক হালকা কিছু খেয়ে নেন চৌধুরী সাহেব। চল্লিশ বছর বয়স হয়ে গেলে দু-বেলা নাকি ভাত খেতে নেই। তাতে মেদ বাড়ে, এই হল তাঁর মত।

রাবেয়াকে আসতে দেখে একটু অবাক হলেন। জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতে রাবেয়াই বলল, আমার আব্বাই বললেন, 'আপনার এখানে এসে থাকতে। রাত্রে নাকি আমার সেই গুণ্ডা স্বামীটা ঘর চড়াও হয়ে আমাকে আজ টেনে নিয়ে যাবে খবর পাঠিয়েছে। বোনেরা আমাকে পৌঁছে দিয়ে গেল।'

—'কিন্তু এখানেও তো আসতে পারে ?' চৌধুরী সাহেব বললেন কিছুটা উদ্বিগ্ন স্বরে।

—'এখানে সে আসবে ! আপনার বন্দুকের ভয়ে সে এগোবে না। আপনাকে সবাই মানে আর ভয় করে।'

—'তা' এক কাজ করো না, ওরই ঘর করো। ঝামেলায় কি দরকার।

—না বাবু, ও আমাকে মেরে ফেলতে চায়।'

—'কেন ?'

—'সেসব অনেক কথা। লোকটা নিজে তো অসৎ, তাই আমাকেও অসৎ ভাবে।'

—'তেমন কিছু অসৎ কাজ তুমি কখনো করেছিলে কি ?'

রাবেয়া অসহায়ভাবে মাথা নাড়ল। ভেতরের বারান্দায় ও বসে রইল। কতটুকুই বা ওর বয়স। চোখে মুখে ওর পাপের চিহ্ন নেই। বরং বেশি নির্মল। তবে একটু ভীতু এবং বোকাটেও।

চৌধুরী সাহেব ঘরের মধ্যে এসে সুইচ টিপে আলো জ্বেলে ঠাণ্ডা বাতাস বওয়ার জন্য কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন। ছেলের কথা মনে পড়ল তাঁর। একা আছে বেচারা। একটি নতুন কারখানাকে বাকিতে হাজার চারেক টাকার মাল দেওয়ার জন্য তিনি বকেছিলেন। ওই বলল, 'ভদ্রলোক পেমেণ্ট ডেট ফেল করলেন। ফোনেও পাচ্ছি না।'

—'চট্ করে মানুষকে বিশ্বাস করে ফেল খোকন, মানুষ চেনা সব চাইতে কঠিন কাজ।'

আসিফ বলল, 'আমি বিশ্বাস করে ঠকতে চাই কিন্তু অবিশ্বাস করে নয়।'

—'কিন্তু ব্যবসার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে তোমার এই নতুন ব্যবসায় নয়। ওটা সাধারণ বন্ধুত্বের বা সামাজিকতার কথা। বেশি পাকামি কোরো না। তাহলে বিয়ে দিয়ে দেবো। তোমার মা থাকলে এসব হতে দিতেন না।'

রাবেয়া চা নিয়ে এলো।

রাবেয়াকে চৌধুরী সাহেব বললেন, 'ওঘরে বিছানাপত্র ঠিক করে নাও। যুধিষ্ঠির ওঘরে শুত। ও আজ কোথায় শোবে?'

যুধিষ্ঠির হাত-পা ধুয়ে জামা গায়ে দিয়ে চাদর জড়াতে জড়াতে এসে বলল, 'বাবু আজ ঘরে যাব। মায়ের শরীর ভাল নেই। যেতে বলেছে।'

—'ও! তাই নাকি! যাও তবে। কিন্তু আমি না থাকলে তুমি এই বাগান বাড়ি ফেলে চলে যেতে নাকি?'

—'না বাবু, তা যেতাম না। মায়ের অম্বল শুলের ব্যামো, আবার পেচ্ছাবের রোগ, কাহিল হয়ে গেছে। আজ যদি ব্যথা ধরে তো সারারাত চেঁচানির চোটে আর ঘুম হবে না। একটা বিধবা বোন আছে, সেও যেমন বোকা, তেমনি ঘুম-কাতুরে।'

চৌধুরী সাহেব কতকগুলো ট্যাবলেট দিলেন, বললেন, 'এইগুলো হজমের জন্য খাওয়াবে, যদি খুব যন্ত্রণা হয় তবে এই ট্যাবলেটটা খাওয়াবে। ঘুমিয়ে পড়বেন। ডাক্তার দেখাও, পুরোনো ভারী রোগ নিয়ে বসে থাকা ঠিক নয়।'

যুধিষ্ঠির চলে গেল।

গেটে চাবি দিয়ে এলেন চৌধুরী সাহেব।

চারদিক নির্জন বাঁশ বাগান, বনজঙ্গল। উত্তরে কিছু দূরে ধান চাষের শূন্য মাঠ। কিছু দূরে আছে বাগ্‌দি পাড়া। মিনিট কয়েক ছাড়া ছাড়া বাস যাওয়া-আসার শব্দ। খানিকটা দূরে বিবিহাটের মোড়। মদ-মাতালে লোকেরা সন্ধ্যার কিছু পর পর্যন্ত গুলতানি করে। একটু রাত হলে সবই ঠাণ্ডা। মাঝে মাঝে শিয়াল ডাকে। বাদুড়ের চিৎকার শোনা যায়।

ঘরদোর বন্ধ করে দিয়ে বিছানা ঠিক না করেই মাথা গুঁজে বসে রইল রাবেয়া। বাবুর সম্বন্ধে সে নানান কিছু উল্টোপাল্টা ভাবতে লাগল। যা ঘটে ঘটবে। কি করেই বা সে আর প্রতিরোধ করবে?

চৌধুরী সাহেব পড়তে বসে অন্যমনস্ক হয়ে যান। রাবেয়ার কথা ভাবেন। মেয়েটাকে দেখতে ভাল। বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। শরীরের গঠনটিও ভাল। ওর বিয়ের পর একটি সন্তান হয়ে গেছে এমন বোঝা যায় না। আঁটসাঁট যাদের বাঁধুনি আর পেটের রোগ কম সাধারণত তাদের শরীর ভালো থাকে। রাবেয়ার নখ দাঁত পরিষ্কার। মুখে চোখে একটি কোমল কিশোরীসুলভ ভাব আছে এখনো। ও হাসলে বেশ দেখায়। ঠোঁটের জোড়মুখ দুটো ভারি চমৎকার। নাকটিও মসৃণ-তীক্ষ্ণ ধরনের। এরা বোধহয় একটু রুচিশীলা আর উন্নাসিক হয়।

—'রাতের খাবার আপনি কখন খাবেন?' রাবেয়া দোরগোড়ায় এসে শুধোলে।

—'তুমি এ বেলা কিছু খাবে না?'

—'না, আমার কিছু লাগবে না।'

—'তোমার মেয়েটাকে আনলে পারতে।'

—'ও আমার মায়ের কাছেই থাকে, আমি জোর করে ধরলে গাল দেয়।'

—'তাই নাকি! তোমার মা তাহলে মেয়েটাকে ভুলিয়ে কোল-ছাড়া করে নিয়েছে! অল্পবয়সী মেয়ের দুর্ভাগ্য ঘটলে মায়েরা সাধারণত এই রকম করে। মেয়ের যদি আবার বিয়ে দিতে হয় তবে পথের বাধাটুকুকে খানিকটা অন্তত সরিয়ে রাখে।'

চৌধুরী সাহেব কথা বলতে বলতে মিট্‌সেফ থেকে খাবারগুলো বার করে নিলেন। পাঁউরুটি আর জেলি নিয়ে খেতে বসলেন। হিটারের প্লাগ লাগিয়ে দুধটা গরম করে দিলে রাবেয়া।

—'কিছু তো খাবে। একেবারে খালি পেটে থাকা ঠিক নয়। এই পাঁউরুটি খানিকটা খাও।'

—'না, আমি কিছু খাব না বাবু। বাচ্চাটার আমার খুব জ্বর দেখে এসেছি। জ্বরে একেবারে হুঁশ নেই।'

রাবেয়ার চোখ দুটোতে জল ভরে আসে। কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে যায়।

চৌধুরী সাহেব এঘরে এসে দোর বন্ধ করে দিয়ে শুয়ে বই পড়তে শুরু করলেন।

এর মধ্যে কখন যে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বুঝতে পারেননি। বাইরে হঠাৎ যেন কিসের শব্দ হল না? উঠে পড়ে তিনি বন্দুকটা তুলে নিলেন। দোর খুলে ফেললেন। দেখলেন, রাবেয়া বিছানায় কুঁকড়ি হয়ে পড়ে আছে। নতুন লেডিজ চাদরটা ছাড়া ওর গায়ে দেবার কিছু নেই। যুধিষ্ঠিরের কাঁথা-কম্বল ও নেয়নি। বোধহয় দুর্গন্ধ লেগেছে।

ডাকলেন, 'রাবেয়া—রাবেয়া।'

—'বাবু!' ধড়মড় করে উঠে বসল রাবেয়া।

—'বাইরে একটা কিসের শব্দ হল না?'

রাবেয়া ভয়ে ত্রাসে শীতে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। গায়ে ওর হাত রাখলেন চৌধুরী সাহেব। নিজের গায়ের ওপর খানিকটা চেপে ধরলেন। রাবেয়া আড়ষ্ট-কাতর। মুখটা তুলে ধরতে দেখলেন ঘুমোবার আগে কেঁদেছিল মেয়েটি—চোখের জলধারা শুকিয়ে আছে।

ঠোঁট দুটো কাঁপছে। আবার ও কাঁদতে লাগল। ওর অসুস্থ মেয়েটার জন্যে বোধহয় কাঁদছে। অথচ বদমায়েসটার জন্যে বাড়িতে থাকতে পারেনি।

চৌধুরী সাহেব দোর খুলে বাইরে গেলেন। ফাঁকা আওয়াজ করলেন। চারদিকে প্রতিধ্বনিত হল সেই আওয়াজ।

খিড়কির দিক থেকে ফিরে এসে সামনের গেটের দিকে গেলেন। তিন-চারজন লোকের পাঁচিলের কোল বেয়ে বাঁশবনের ওদিকে ছুটে পালিয়ে যাবার দুদ্দাড় শব্দ পেলেন। চাঁদের আলোয় চারদিকটা বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ছায়ার মধ্যে অন্ধকার। আবার তিনি বাঁশ বনটার দিকে ফাঁকা আওয়াজ করলেন।

রাবেয়ার কথা তাহলে ঠিক। ওরা পাঁচিল টপকাতে পারেনি। উঁচু পাঁচিলের মাথায় বাঁকানো ধারালো শিক আর কাঁটাতার দেওয়া আছে।

ফিরে এসে দোর বন্ধ করে দিলেন। বললেন রাবেয়াকে, 'তুমি ঠাণ্ডায় কুঁকড়ে এইভাবে শুয়ে আছ কেন? চলে এসো এঘরে। এই বিছানায় আমার লেপ কম্বল দিলে নোংরা হয়ে যাবে। যুধিষ্ঠির তো কোনোদিন সাবান মাখে বলে মনে হয় না। ও বেটাকে ঘরে থাকতে না দেওয়াই ভাল। এসো, দ্বিধা করছো কেন? বদমাসরা এসেছে— এঘরে কিছু ঘটে গেলে হয়তো আমি টেরও পাবো না। একালের চোররা নানা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে দোর জানলা কেটে ফেলে নিঃশব্দে। এসো—' রাবেয়াকে হাত ধরে নিজের ঘরে আনলেন চৌধুরী সাহেব।

রাবেয়া কাঁপতে লাগল। তাঁর স্বামী আনসার যদি তাকে ধরে তে মেরে ফেলবে। সে যতখানি রূপসী ততখানি আদর ভালবাসাই তে পেতে চেয়েছিল, কিন্তু লোকটা মাতাল, চরিত্রহীন, গুণ্ডা প্রকৃতির কিন্তু বন্দুকের ভয়ে এখানে ঢুকতে সাহস করেনি।

—'রাবেয়া, অবাধ্য হয়ো না, শুয়ে পড়ো ওদিকটায়—' ওকে জো করে ধরে পাঁজাকোলা করে তুলে ডবল বেড বিছানার ওপাশে ফেলে

লেপ চাপা দিয়ে দিলেন। তারপর চৌধুরী সাহেব বলতে লাগলেন, 'আসুক, ভেতরে ঢুকুক, তোমার সোয়ামী ভদ্দরলোক। কুত্তার মতন গুলি করে মেরে রাখব। পাঁচিলের পাশে এসে পট্‌কা ছুঁড়েছে। বন্দুকের আওয়াজ শুনে বাঁশবনের মধ্যে দিয়ে লোকজন নিয়ে পালিয়েছে। ইডিয়েট! ভাত দেবার মুরোদ নেই, কিল মারবার গোঁসাই।'

চৌধুরী সাহেব এসে শুয়ে পড়লেন। বললেন, 'আজকে বেশ কনকনে ঠাণ্ডাও পড়েছে।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। বাইরে মাঠে শেয়াল ডাকতে লাগল। শিশির ঝরে পড়ার টুপটাপ শব্দ হচ্ছে বাঁশবনটার দিকে।

চৌধুরী সাহেব হঠাৎ লেপ সমেত রাবেয়াকে কাছে টেনে আনলেন।

রাবেয়া ভয়ে কেঁদে ফেললো।

—'আরে, কাঁদো কেন তুমি। তোমার মেয়েটার জ্বর। অত্যাচারী স্বামীর ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছ। আমি কাল থানায় গিয়ে ও ব্যাটার বাড় ভেঙে দিয়ে আসব। শোন রাবেয়া, তোমার সম্বন্ধে অনেক কথা ভেবেছি, তোমাকে রক্ষা করা দরকার। তুমি যদি আমার বাধ্য হও, তাহলে তোমার দুঃখ ঘুচে যাবে। রাবেয়া—'

সাড়া দিল না রাবেয়া।

তার মুখটা খুলে ফেললেন চৌধুরী সাহেব। বললেন, 'তাকাও আমার দিকে।'

রাবেয়া তাকাতে গেল কিন্তু পারল না।

ওর মাথাটা টেনে নিয়ে কপালের ওপর গাল চেপে ধরে তিনি বললেন, 'তোমার দুঃখের ভার আমি নিলাম। আজ থেকে তুমি আমার মেয়ে।'

জোরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল রাবেয়া। হায়, তার ভুল আর দুশ্চিন্তা মাকড়সার জালের মতো যে সব ছিঁড়ে গেল!

—'আর কাঁদিসনি! আমার মেয়ে নেই, মেয়ে থাকলে তার ঘাড়ে

বুড়োবেলার সেবাযত্নের ভার চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় যতখানি ততখানি কি ছেলের বউ দিয়ে হয়? শোন্, আমার কথার বাধ্য থাকবি তো?'

মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল রাবেয়া।

—'এবার থেকে তোর চাকরিটা গেল। আর মাইনে পাবি না।'

উঠে বসে চুল গুটোতে গুটোতে রাবেয়া বলল, 'বাপ আবার মেয়েকে কবে মাইনে দেয়!'

—'এই তো চাই। কালই তোকে স্কুলে ভর্তি করে দোব। আমার মেয়ে হতে হলে পড়াশুনো করতে হবে। এম.এ. পাস করার পর এই বাগানবাড়ি আর কিছু ধানজমি কিনে তোর নামে লেখাপড়া করে দেবো। রাজি তো? সকালেই তোর বাপকে ডেকে আনিস।'

'আচ্ছা বাবা।' বলে রাবেয়া নিশ্চিন্ত এক সুখের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে উঠে দেখল চৌধুরী সাহেব মুখ হাত ধুয়ে চা করে খেয়ে নিয়েছেন। সে লজ্জা পেল। বাইরে গেল। মুখ হাত ধুয়ে এলে চৌধুরী সাহেব ডাকলেন কাছে। হাত ধরে কাছে টেনে বললেন, 'এবার থেকে তোর আর বাজারে যাওয়া চলবে না। বাজারের থলেটা আমায় দে। আমিই যাই। আজ মাংস হোক। দুপুরে তোকে নিয়ে স্কুলে যাব। পরশু বই কিনে আনব। পড়াশুনো করবি। বুঝলি?'

যুধিষ্ঠির এসে গেছে। সে বলল, 'ওষুধ খাওয়ানোর পর মা ভাল আছে।'

চৌধুরী সাহেব বাজারে চলে গেলেন। রাবেয়া তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে ছুটল। ইচ্ছা, তিনি ফেরার আগেই ফিরে আসবে। পরে তার ভাইবোনদের আসতে দেখল। তারা কাঁদছে চোখে হাত মুছতে মুছতে।

—'কাঁদছিস কেন, কি হয়েছে?'

শুধোতে তারা জানাল যে তার ময়না নাকি আর নড়ে না চড়ে না কথা বলে না। মা ডাকতে পাঠাল।

রাবেয়া ছুটতে ছুটতে বাড়ি গেল। গিয়েই তার বাচ্চাকে বুকে তুলে নিয়ে মুখে চুমু খেতে গিয়ে দেখল সে মারা গেছে। তখন সে চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। মাথা কুটতে লাগল। বিলাপ করতে লাগল, সে যদি বাবুর বাগানে মান ইজ্জতের ভয়ে না পালিয়ে গিয়ে রাত কাটাত হয়তো তার বাচ্চাটা এমন করে জ্বরের ঘোরে মারা যেত না।

পাড়ার মেয়েরা তার কাছ থেকে বাচ্চাটিকে সরিয়ে নিলে। একটি মেয়ে বলল, 'বাবুর ঘরে রাত কাটিয়ে এসেছে, ওকে মরা লাস ছুঁতে দেওয়া ঠিক হয়নি।'

রাবেয়া তার কথা শুনে শুধু কটমট করে তাকাল। মানুষ যে কত নীচ হীন হতে পারে তাই ভাবল। তার বাচ্চাটা যাতে মরে হয়তো তার মাও সেই ব্যবস্থা করেছে। একেই তো সে নিজে গলগ্রহ হয়েছে, তার ওপর মেয়েটা বড় হয়ে আবার দ্বিগুণ ভার বাড়াবে?

মানুষ নিজের সুখের জন্য তাহলে মানুষকে মেরে ফেলতে পারে। হয়তো সে ইচ্ছা মনের গোপনে লুকিয়ে থাকে। মা এক সময় প্রকাশ করেই ফেলল, 'গেছে তোর আপদ গেছে, কি হবে হারামীর পয়দাসকে বাঁচিয়ে রেখে?'

চৌধুরী সাহেব বাজার থেকে ফিরে ঘণ্টা দুই কেটে যাবার পরও যখন রাবেয়া এলো না তিনি নিজেই বের হলেন ওদের বাড়ি যাবেন বলে। পথে শুনলেন রাবেয়ার বাচ্চাটা মারা গেছে গত রাত্রে। রাবেয়াদের বাড়ি মাটির একটা কুটির। উঠোন ঘেরা নয়। রাজ্যের মেয়েরা হট্টগোল করছে। রাবেয়ার বাপ বেরিয়ে এলেন। সালাম জানালেন। তাঁকে নিয়ে বাগানবাড়িতে আবার চলে এলেন চৌধুরী সাহেব। বললেন, 'বাচ্চাটার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করুন দাউদ ভাই—গোটা কুড়ি টাকা নিয়ে যান। আর আপনার রাবেয়াকে, আমি লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তুলতে চাই। ওকে আমার মেয়ে হিসেবে গ্রহণ করতে চাই।'

দাউদ সেখ চোখের জল মুছতে মুছতে বললেন, 'তাহলে তো ওর

দুঃখের দিন ঘুচে যায় চৌধুরী সাহেব। আমার কোনরকম আপত্তি, নেই। আপনি ব্যবস্থা করুন।'

দুপুরের পরেই রাবেয়া চলে এলো। তার মাও এসেছে সঙ্গে। বাবুর রান্না খাওয়া বন্ধ।

রাবেয়া এসে চৌধুরী সাহেবের পায়ের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল, 'বাবা, আমার বুকখানা ভেঙে গেল বাবা! আমি কি করে বাঁচব?'

চৌধুরী সাহেব সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। বললেন, 'ওসব ভুলে যা মা—জানবি তোর বিয়ে হয়নি—স্বপ্নে ওসব ঘটে গেছে। শক্ত হ। শোকে দুঃখে নিজের শরীর নষ্ট করিস না। তোকে অনেক বড় হতে হবে।'

রাবেয়ার মা রান্না করতে বসল। রাবেয়া পাশে চুপচাপ বসে রইল।

চৌধুরী সাহেব চুপচাপ বই পড়ে সময় কাটাতে লাগলেন। রাবেয়া মাঝেমাঝেই একা-একা কাঁদছে। রান্নার পর বাড়ির রাঁধাবাড়ার কাজ দেখার জন্য ওর মা বুড়ী বাড়ি চলে গেল।

তিনটের পর চৌধুরী সাহেব খেলেন।

যুধিষ্ঠিরও খেল। তাকে চৌধুরী সাহেব বললেন, 'রাত্রে তুমি বাড়ি যাবে। এখানে থাকতে হলে তোমার ঐ মালীর ঘরটা ছেয়ে-ছুয়ে নাও।'

যুধিষ্ঠির সেদিনের মতো বাড়ি চলে গেল।

রাবেয়া খেতে চাইল না।

চৌধুরী সাহেব তাকে ধরে উঠোনে বসিয়ে মাথায় জল ঢেলে দিয়ে স্নান করালেন। ওর মা ব্যাগ ভরে যে সব কাপড়-চোপড় দিয়ে গেছে তার ভেতর থেকে টেনে বার করলেন একখানা শাড়ি।

সেই শাড়ির সঙ্গে হঠাৎ বেরিয়ে এলো তার বাচ্চাকে চৌধুরী সাহেবের কিনে দেওয়া সেই নতুন লাল ফ্রকটা। সেটা দেখতে পেয়েই হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে গেল রাবেয়া, হাত বাড়িয়ে নেবার জন্যে এগিয়ে আসতে গিয়ে।

চৌধুরী সাহেব ব্যস্ত হয়ে রাবেয়াকে ধরে তুললেন। মুখে জলের ছিটে মারতে লাগলেন। রাবেয়ার জ্ঞান ফিরছে দেখে তিনি তাড়াতাড়ি ফ্রকটা লুকিয়ে ফেললেন। নিজের হাতেই ওর ভিজে কাপড়চোপড় ছাড়িয়ে দিলেন। যেন সম্বিৎহারা রাবেয়া। এই শোকের মধ্যে, অগাধ স্নেহের মধ্যে, চেতন-অবচেতন এক আলো-আঁধারি অনুভূতির মধ্যে, পিতা আর আদর্শ পুরুষের শক্তিমান পরিচর্যার মধ্যে রাবেয়া নিজের দৈহিক লজ্জাকে ঢাকার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়নি—বরং সে শিশুর মতো আত্মভোলা হয়ে এক সজ্জন পুরুষের হাতে নিজেকে সমর্পণ করেছে।

চৌধুরী সাহেব রাবেয়াকে তুলে এনে বসালেন, খাওয়াতে লাগলেন নিজের হাতে। রাবেয়া ভাবল সত্যিই সে যেন আবার এক রকম-ভাবে জন্মগ্রহণ করেছে। এমন পুলক, এমন নির্মল আনন্দ সে কখনো অনুভব করেনি।

খাওয়াবার পর তাকে বিছানায় এনে শুইয়ে লেপ চাপা দিয়ে বাইরে এলেন চৌধুরী সাহেব।

ফুলে ভরা গাছগুলোর দিকে তাকাতে মনে হল, তারা যেন তার দিকে চেয়ে হাসছে।

একটা ইজিচেয়ার এনে নতুন একখানা উপন্যাস খুলে নিয়ে গা এলিয়ে দিলেন চৌধুরী।

বাস থেকে নামার আগেই ঝড় বৃষ্টি নামল। সারাদিন প্রচণ্ড গুমোট গেছে। আবহাওয়া ঠাণ্ডা হতে মানুষ স্বস্তি পেল বটে কিন্তু রেবেকা চৌধুরীর হল বিপদ। তার লাস্ট স্টপেজ এসে গেল। কিছু লোক গুঁতোগুঁতি করে নামল। রেবেকা নেমে দশ-বারো পা এগিয়ে বিরাট তেঁতুল গাছটার নিচের মনিহারী দোকানটার পাশে দাঁড়াতে গেল। রাজ্যের বখাটে ছোঁড়া দাঁড়িয়ে। কেউ হাসল। অহেতুক চেঁচাল। ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করল। একটি বালা হাতে ঘাড়ে চুল গলায় লকেট মস্তান ছোকরা বলল, 'বারেক ঝড়বিষ্টি এয়েছিল মাইরি!'

মাথায় টাক বুড়ো হোমিওপ্যাথ মুসলমান ডাক্তারটি কুটকুট করে তাকালেন। বললেন, 'ভেতরে এসে বসুন—ভিজে যাবেন, যা ঝড়-ঝাপটা লাগছে!'

রেবেকা মৃদু একটু হেসে ধন্যবাদ জানাল। রুমাল বাঁধা ঘড়িটা একটু দেখল। আটটা বেজে গেছে। আজ একটু দেরি হল। কলেজের মিটিং ছিল।. নতুন প্রিন্সিপ্যাল এসেছেন। তাঁকে সম্বর্ধনা দিতেই দেরি হল। তারপর ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের খেলা ছিল। মারদাঙ্গা হয়েছে। মফস্বলের বাসগুলো কোথায় পালিয়ে গিয়ে থাকে কে জানে। খেলার ছেলেরা দল বেঁধে আসে, ভাড়া দেয় না।

একটা রিকশও নেই আজ এই মোড়ে। এখানটায় তিন-চারটে কসাইখানা, পাইস হোটেল, চায়ের দোকান, দর্জির দোকান, নিচু শ্রেণীর মুসলমান লোকজনদের ভিড় বেশি।

একজন রিকশওলাকে দেখে রেবেকা ডাকল। বলল, 'কলিমবেড়ে যাবে?'

'দশ টাকা ভাড়া লাগবে।'

'দেড় টাকা তো রেট।'

'এখন রেট-ফেট নেই।'

রিকশওলা চলে গেল ভিজতে ভিজতে। মুষলধারে বৃষ্টি নেমে ঝড়ের বেগটা কমে গেছে। বিদ্যুতের তলোয়ার আকাশখানাকে চিরে-ফেঁড়ে দিয়ে মেদিনী কাঁপিয়ে বজ্রপাত ঘটাতে রেবেকার বুকখানা কেঁপে উঠল। বাজ পড়াকে ছোটবেলা থেকেই তার বড় ভয়। আগে খাটের নিচে গিয়ে লুকোত। বাবা বলতেন, মেয়ের কি ভয়, খাটের ওপর বসো বা শুয়ে পড়ো, ভয় নেই, নিচের মেঝেয় বসলে তো আরো ভয়। শুকনো কাঠে বিদ্যুৎ ধরে না। পায়ে প্লাসটিক রবার সোল জুতো থাকলে ভয় নেই।

তবু ভয় করে। পাশের ছোঁড়াগুলো চেপে দাঁড়াচ্ছে দুপাশে। ওরা কি ষড়যন্ত্র করছে যেন ইঙ্গিতধর্মী ওদের ইটবিট করা ভাষায়। তাকে পথের মাঝখানে ধরবে? ছেলেগুলোর বয়স ষোল থেকে কুড়ির ভেতরে। রেবেকার বয়স ছাব্বিশ।

আধঘণ্টা পার হয়ে গেল। রিকশও আর আসছে না। আচ্ছা বিপদ তো! বুড়ো ডাক্তারের দোকানটায় ঢুকবে নাকি? তারও তো সাপুড়ের মতো চোখ।

একটি আলো আসছে বৃষ্টির ঝাপসা দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে। ক্রমেই এগিয়ে এলো গাড়িটা। ট্যাক্সি বাঁধল মোড়টাতে। রেবেকা চিনতে পারল, একক যাত্রী, তাদের কলিমবেড়ে কলোনীর স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বড় ডাক্তার। ট্যাক্সিওলা বলছে, ভেতরে আর সে যাবে না। ফেরার সময় নির্জন পথে বিপদের ভয় আছে।

ডাক্তার বলেন, 'আরে দূর, কিচ্ছু বিপদ নেই—চলো তো।' একটি ছেলেকে ডেকে ডাক্তার বললেন, 'এই যে ভাই, এক প্যাকেট সিগারেট দাও তো।'

রেবেকা দেখল এখন আর লজ্জা শরম বা জড়তা দেখালে চলে না। ডাক্তার তার দিকে তাকাতে সে একটু হাসল বোকার মতন। যদিও পরিচয় নেই তবু একই কলোনীর বাসিন্দা তাঁরা।

ডাক্তার বললেন, 'আপনি তো কলিমবেড়ে কলোনীতে যাবেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, রিকশও পাচ্ছি না।'

'উঠে আসুন আমার ট্যাক্সিতে।'

'ধন্যবাদ।' রেবেকা ভিজতে ভিজতে ছুটে এসে উঠে পড়ল। ট্যাক্সিওলা আবার গুঁইগাঁই করতে লাগল।

ডাক্তার নিশীথ সেন বললেন, 'চল্ বাবা, আরো দুটো টাকা এক্সট্রা নিবিখন। কেন জ্বালাস আর এই বৃষ্টিবাদলার সময়। সব সময় কি আর মানুষ বেশি টাকা ট্যাঁকে নিয়ে বেরোয়।'

ট্যাক্সি চলতে শুরু করল।

ছেলেগুলো হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

সিগারেট ধরালেন ডাক্তার। বললেন, 'এ বছর আর বৃষ্টি যাবে না, ইন্দোনেশিয়ার মতো এক দুপুর রোদ হয়, তার পরেই বৃষ্টি, ঝড়। বিকেলকে আর বিশ্বাস নেই। তা আপনি ছাতা নেননি কেন?'

অপরাধের হাসি হাসল যেন।

'এত দেরি করে ফিরবেন, গ্রামের মধ্যে থাকেন, ফিরতেন কি করে বলুন তো?'

'এই তো আপনি এসে পড়ে উদ্ধার করলেন।' কথাটা বলে ফেলেও রেবেকা যেন অস্বস্তিতে পড়ল। ডাক্তার সেন বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে থেকে তাকে দেখছেন। বললেন, 'আপনি কি ভাগ্য, নিয়তি, ঈশ্বর এসবে বিশ্বাস করে অনিশ্চয়তার মধ্যে বাস করেন?'

রেবেকা বলল, 'না, মানে, সব কিছু তো আর মানুষের আয়ত্তের মধ্যে থাকে না।'

'বাস্তববাদী হোন। আপনি তো রোজই কলকাতা শহরের দিকে যান দেখি। কি করেন, চাকরি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আজ্ঞে ফাজ্ঞে করে কথা বলেন, রক্ষণশীল বাড়ির মেয়ে নাকি আপনি?'

হাসল রেবেকা। সরু মতো সর্পিল রাস্তা মাঠের মধ্যে দিয়ে চলেছে। দেখা গেল একটা সাপ পার হয়ে চলে গেল।

'আপনার বাবাকে আমি জানি। হসপিটাল কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান তিনি। মনিহারী দোকান করেছেন রিটায়ারমেণ্টের পর।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আবার আজ্ঞে হ্যাঁ!'

'অভ্যাস হয়ে গেছে যে…'

কিছুক্ষণ চুপচাপ তুজনে। বৃষ্টির আর গাড়ির শব্দ। বিদ্যুৎ ঝলকাচ্ছে। দূরের গাছপালা দেখা যায়। একটা পল্লীর মধ্যে দিয়ে গাড়ি চলছে।

'আপনার গা থেকে একটা গন্ধ পাচ্ছি, অডিকোলন, না?'

'হ্যাঁ।'

'কি চাকরি আপনার, স্টেনো?'

'না।'

'কি তবে?'

'এমনি একটা।'

'তবু?'

'একটা কলেজে পড়াই।'

'সাবজেক্ট?'

'কেমিস্ট্রী'।'

'তাই নাকি! আমি ভাবলাম বাংলা। কারণ আপনার চেহারা হাবভাব পোশাক দেখে ভাবপ্রবণ বাঙালী মেয়ের মতোই মনে হয়।'

'সে আমাদের মাটির গুণ।'

'ইণ্ডিয়া কিন্তু সায়েন্সে এগোচ্ছে।'

'আমাদের ব্রেন খারাপ নয়।'

'আপনি কি জানেন আমেরিকার যে কলম্বিয়া রকেট আকাশে যাত্রী নিয়ে গেল এলো তার নির্মাণকাজে এখানের একটা গ্রামের ছেলে মিঃ কয়াল আছেন?'

'শুনেছি।'

'আমিও কত আশা করেছিলাম আমেরিকায় যাব। বিলেতে গিয়ে

এফ. আর. সি. এস. হব। কিছুই হল না। শেষবেলা কলিমবেড়িয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ডাক্তার।'

'তবু কি খারাপ নাকি?'

'কত আর উপায়?'

'খুন-জখমের রিপোর্ট থেকে টাকা আসে না?'

'কেন, সে রকম শুনেছেন কিছু নাকি?'

'না।'

'তবে বলছেন?'

'সাধারণত ঐরকম হয়। থানা বসে থাকে খুনের ডাক্তারী রিপোর্টের জন্য। যার রিপোর্ট লিখবেন সেও দেবে কিছু।'

'অতএব দেশে যত খুন-জখম হয় ততই ডাক্তারদের লাভ, কি বলেন?'

'এ বিষয়ে আমি কিছু বলি না।'

'তাহলে খুন হবে না, রোগ হবে না, ডাক্তাররা বাঁচাবে কি করে?'

'আপনি তো ঈশ্বরের বাঁচাকেও বিপন্ন করে তুলেছেন।'

ডাক্তার হেসে উঠলেন। বললেন, 'বেচারা—'

তারপর বললেন, 'বেচারার পিঠে গাধার বোঝা চাপিয়েছে মানুষ!'

গাড়ি এসে গেল। সামনেই ডাক্তারের বাড়ি। রেবেকাদের বাড়িটা একটু ভিতরে।

নিশীথ সেন নেমে পড়ে টাকা দিলেন ট্যাক্সিওলাকে।

রেবেকাও নামল। ডাক্তার বললেন, 'নামলেন কেন, দিয়ে আসত আপনার বাড়ি পর্যন্ত, ভিজে যাবেন।'

'ঠিক আছে। অশেষ ধন্যবাদ।'

'আসুন না, একটু কফি খেয়ে যাবেন।'

বোকার মতো হাসল রেবেকা। ডাক্তারের চোখ দুটো ভীষণ চকচকে। বলল, 'আর একদিন। রাত হয়ে যাচ্ছে।'

ডাক্তার যেন আশীর্বাদের হাত তুললেন। তারপর ঢুকে গেলেন দোরের পাল্লা ঠেলে।

ট্যাক্সি ঘুরে বেরিয়ে গেল।

আম জাম নারকেল গাছের নিচে দিয়ে কলোনীর পথ। বৃষ্টি ঝরছে তখনও আস্তে আস্তে।

বাবা মা ছোট ভাই সবাই উদ্বিগ্ন।

বালতির জলে পা ধুয়ে ভেতরে ঢুকে যীশুর ছবিটার দিকে তাকিয়ে বুকে ক্রশ করল রেবেকা।

মা বললেন, 'এলি কি করে, রিকশ পেলি?'

বাবা বললেন, 'কতক্ষণ ওয়েট করার পর দোকান বন্ধ করে এলাম। দীপু সাইকেল নিয়ে গিয়েছিল। ভিজতে ভিজতে ফিরল।'

রেবেকা কিছুই বলল না। কাপড়চোপড় ছাড়ল।

মা কফি আর নোনতা বিস্কুট দিল।

বিছানায় শুয়ে পড়ল রেবেকা।

আবার চেপে বৃষ্টি নামল। লবঙ্গলতার নোলক নোলক ফুলগুলো জলে ভিজে বাতাসে দুলছে। কাঁচালেবু ভরা বাতাবী গাছটায় আলো পড়েছে পেছনের। বাড়িটা চ্যাটার্জীদের। রেবেকারা খ্রীস্টান বলে তেমন কারো সঙ্গে আত্মীয়তা নেই। কুমিল্লা থেকে তারা এসেছে। সেখানে নাকি সম্পত্তি ছিল। ঠাকুরদাদা ছিলেন রায় বাহাদুর। এখানে এইমাত্র তিন কামরার একতলা বাড়ি। তাও তৈরি করতে পঞ্চাশ হাজার টাকা গেল। ঋণ করতে হয়েছিল—তা অবশ্য মুকুব হয়ে গেছে।

অনেকগুলো মুখ ঘুরেফিরে বেড়ায় রেবেকার সামনে। আজ নতুন মুখ প্রিন্সিপ্যাল আর ডাক্তার সেনের। দুজনেই অবিবাহিত। দুজনেই বৈদ্য। কিন্তু হিন্দু তো বটে।

ডাক্তার বোধহয় নাস্তিক। বেশ কথা বলেন।

আর একদিন সে রিকশয় উঠে যাচ্ছিল—হঠাৎ ডাক্তার সাহেব হাঁক দিলেন, 'এই রিকশওলা, দাঁড়িয়ে।'

রেবেকা দাঁড়াতে বলল।

বিনা বাক্যব্যয়ে ডাক্তার একটা ব্যাগ নিয়ে স্টেথেসকোপ গলায়

ঝুলিয়ে এসে রিকশয় উঠে বসলেন।

'কলেজে যাচ্ছেন বুঝি?'

হাসল রেবেকা।

'ওই ছাখো, নলটা আবার ঘাড়েই ঝুলছে যে!'

আবার হাসল রেবেকা।

'আপনাদেব কোনো প্রফেসার ছাতা বগলে করে ক্লাসে ঢোকেন না?'

না।' বলে হাসল রেবেকা।

'আমাদের এক বৃদ্ধ ডাক্তার প্রফেসর একদিন জুতো পায়ে না দিয়েই এসে মুচিকে বলেছিলেন, দাও বাবা জুতোটা সারিয়ে। আঙুল বেরিয়ে পড়ে, সবাই নিন্দে করে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর এক ছাত্রী তাঁকে কুশলাদি জিজ্ঞেস করাব পর বলল, কই আপনার জুতো সারা হল? তিনি মুচির কাছে জুতো চাইতে সে বলল, কই জুতো তো বাবু দেননি। তখন ডাক্তার প্রফেসার বললেন, তাহলে কি আমি জুতো পরে আসিনি?'

রেবেকা হাসল। বলল, 'আপনার এটা বানানো গল্প।'

'এমন ভাল গল্প বানাতে পারলে ডাক্তারী ছেড়ে দিয়ে উপন্যাস লিখতাম।'

দুজনে চুপচাপ। কেমন যেমন সুর কেটে গেছে। রেবেকা তো অন্যমনস্কতার অমনি কত গল্পই শুনেছে আগে।

এক সময় ডাক্তার বললেন, 'আপনারা তো খ্রীস্টান, না?'

'হ্যাঁ।'

'আমি হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান বৌদ্ধ সবই—অর্থাৎ কিছুই না অথবা নাস্তিক। আমি মানবিকতাবাদী।'

রেবেকা বলল, 'ডাক্তারের জন্য মানবতাই হল আসল ধর্ম।'

'আচ্ছা আপনি কি মনে করেন আপনার কোন খ্রীস্টান ছেলে ছাড়া বিয়ে হতে পারে না?'

রেবেকা বলল, 'আপনি কি মনে করেন আপনার কোনো হিন্দু

মেয়ে ছাড়া বিয়ে হতে পারে না ?'

'মোটেই না।'

'আমিও তাই মনে করি। কিন্তু বিয়েটা যতখানি নিজের ওপরে নির্ভর করে তার চাইতে বাবা-মা বা পরিবার-পরিজনের ওপরেও নির্ভর করে বেশিটা।'

ডাক্তার সেন আর কিছু বললেন না। মাঠে বোরো ধান কেটে রাস্তার আলে তুলছে চাষী-মেয়েরা।

'আপনি এনগেজ্‌ড নন তো ?'

'না।' মাথা নাড়ল রেবেকা।

'আমার মতো ছোট একটা হাসপাতালের ডাক্তার কি বিয়ের কথা ভাবতে পারে ?'

'মানবতাবাদী যখন ভাবলেও পারেন।'

'কোনো গরীবের মেয়ে উদ্ধার হয়—তেমন কোনো গরিব তো আমার চোখে পড়ছে না—আপনি দেখে দেবেন ?'

'এটা তো গরিবদেরই দেশ, কত মেয়ে আছে !' বলে খুব হাসল রেবেকা।

ডাক্তার এক জায়গায় নেমে গেলেন। খুব হাসি পেল তাঁর। ভদ্রলোক গাম্ভীর্য রাখতে পারলেন না। কেমন যেন হালকা হয়ে গেলেন।

এরপরেই উপযাচক হয়ে হয়তো কথা বলবেন।

বাড়ি ফিরে মার কাছে নিশীথ ডাক্তারের প্রসঙ্গ তুলতে তিনি বললেন, 'বেহায়া, বজ্জাত মানুষ ! ওঁর সঙ্গে মেলামেশা করবি না। সরকারদের হেনা আমাকে গোপনে বলেছে তার মেয়েলি অসুখ নিয়ে ঐ ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল, তার নাকি সর্বনাশ করেছে।'

'বলো কি মা !' রেবেকা যেন সাপের গায়ে পা দিল।

'আরো কত শুনেছি। কুমারী মেয়েরা হাসপাতালে গেলেই ঐ নিশীথ ডাক্তার ছোঁক ছোঁক করে।'

রেবেকা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

ভাবল, এই তোমার নাস্তিকতার মূল উৎস।

কিন্তু রেবেকার সন্দেহ হল, হেনা সরকারও তো ভাল নয়। সে শিকার করে বেড়ায়। সংসারে ওদের অভাব বিশৃঙ্খলা। বাবা ট্রাম কোম্পানীর কাজ সাঙ্গ করে বিছানায় পড়ে আছে। তার নাকি টিবি রোগ, সঙ্গে অ্যাজমাও।

রেবেকার বান্ধবী ইতি সান্যাল গান-বাজনা নিয়ে পড়ে থাকে। তার কাছে জানতে পারল, না, নিশীথ ডাক্তার ভাল লোক। ওঁকে কতকগুলো হাঘরে মেয়ে ফন্দিতে ফেলে বিয়ে করেতে চায়। ডাক্তারকে নাকি ইতি পরীক্ষা করে দেখেছে।

কিন্তু ছোট ভাই দীপক দিন দুই পরে বলল, 'দিদি, তুই ডাক্তারের সঙ্গে ট্যাক্সিতে রিকশায় যাচ্ছিস আসছিস কেন? এ নিয়ে কানাঘুষো চলছে! আর ওঁর সঙ্গে যাবি না।'

রেবেকা ভাবল বলে, সেদিন সন্ধ্যায় যদি ডাক্তার তাঁর ট্যাক্সিতে না আনতেন বৃষ্টির মধ্যে ফিরতেই পারত না, তাছাড়া অন্য বিপদও ঘটতে পারত। কিন্তু বলল না, কারণ রিকশায় করে যাবার কি কৈফিয়ত থাকতে পারে ভেবে পেলে না।

সেদিনও রিকশাওলাকে রেবেকা বলে দিল মোড়ের মাথাটা খুব জোরসে যেন সে বেরিয়ে যায়, কেউ ডাকলে দাঁড়াবে না।

যা ভেবেছিল তাই, ডাক্তার নিশীথ সেন বোধহয় জানলা দিয়ে দেখেছিলেন, তৈরি হয়েই ছিলেন। হঠাৎ বেরিয়ে পড়ে হাঁক দিলেন, 'এই রিকশা, দাঁড়িয়ে…'

কিন্তু দাঁড়াল না রিকশাওলা। রেবেকা বলল, 'দাঁড়াবে না, চলো।'

নিশীথ সেন বললেন, 'আশ্চর্য!'

ছেলের দল হেসে উঠল। টিপ্পনি কাটল, 'একদিন ঝাড় দিতে হবে। হেনাকে মাইরি ইয়ে করেছে।'

অন্য রিকশা নিয়ে ধীরে ধীরে অন্যমনস্ক ভাবে চলতে লাগলেন নিশীথ সেন। শহর গড়ে উঠছে চারদিকে কিন্তু মানুষ এখনো গ্রাম্য স্বভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি। চুলোয় যাক। কারো পারিবারিক

ব্যাপারে তাঁর যাওয়া উচিত নয়।

রেবেকা মোটামুটি সুন্দরী। রুচিশীলা অন্তত পোশাক-পরিচ্ছদে। মেয়েটা তাঁকে কি হন্যে মনে করল? সেদিন কি দরকার ছিল ট্যাক্সিতে করে আনবার? যদিও আনলে ওর রিকশায় যাওয়ার কি দরকার ছিল? খ্রীস্টান বলে ওর সঙ্গে তেমন কোনো হিন্দু ছেলে মেশে না। যারা মিশতে চায় তারা শুধু মওকা মেরে পালাবার ধান্ধা।

কিন্তু রেবেকার সঙ্গে হঠাৎ একদিন বাসে দেখা হল। পাশের সিটেই বসে আছে। ডাক্তার আর কোনো রকম ইঙ্গিত করলেন বা কথা বললেন না। যেন চেনেনই না।

কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে রেবেকা ঘুমোবার ভান করল। এক সময় দেখল ডাক্তার দিব্যি ঘুমোচ্ছেন। আকর্ষণ অনুভব করলে কেউ ঘুমোয় না।

বাম্প—হঠাৎ জার্কিং লাগতে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মুখ মুছে সোজা হয়ে বসলেন। রেবেকা পিছনে। কানের কাছে মুখ। হঠাৎ বলল, 'ডাক্তার লোকের এত ঘুম কেন?'

নিশীথ সেন যেন শুনতে পেলেন না।

'শুনতে পাচ্ছেন না?'

ডাক্তার সাড়া দিলেন না।

অপমান বোধ করল রেবেকা। রিকশা থামায়নি সে তাই বোধহয় রেগেছেন।

'আপনি কানে কালা নাকি?'

তাও শুনলেন ডাক্তার, উত্তর দিলেন না।

একটি ছেলে ডেকে দিল। তার দিকে বড় বড় চোখ বার করলেন ডাক্তার। 'কাঁধে হাত দিচ্ছেন কেন?'

'উনি আপনাকে ডাকছেন?'

'সে আমি বুঝব, আপনি কি ওঁর এজেন্ট?'

ছেলেটি চুপসে গেল।

রীতিমতো অপমান বোধ করল রেবেকা। ম্লান মুখে বসে রইল।

সবাই তার দিকে তাকাচ্ছে। ভাবছে হয়তো খারাপ জাতের মেয়ে। কি ঘেন্না, কি লজ্জা!

ডাক্তার কিছু পরে উঠলেন। যাবার সময় বললেন, 'কিছু দরকার থাকে চেম্বারে যাবেন। এভাবে পথে কথা বলবেন না।'

কি আশ্চর্য! রেবেকার মুখে ঘাম দেখা দিল। একটা কথারও উত্তর দিতে পারল না।

এক ভদ্রমহিলা শুধোলেন, 'আপনাকে উনি চেম্বারে দেখা করতে বললেন, উনি উকিল নাকি?'

রেবেকা হাসল, বলল, 'উকিলদেরই কি শুধু চেম্বার থাকে?'

'তবে? ডাক্তার বোধহয়?'

'হ্যাঁ।'

ডাক্তারের প্রাইভেট চেম্বারে যেতে বলছেন কুমারী মেয়েকে, কি ব্যাপার, এ নিয়ে মেয়েরা ফিসফিস করল।

মরুকগে, যা ভাবে ভাবুক, রেবেকা চুপ করে বসে রইল। পাঁচ কথা ভাবতে গিয়ে তার মনে পড়ল মার কথা। লোকটা খারাপ। মা যদি একথা না বলত তবে এত নোংরা পরিস্থিতিতে সে পড়ত না। পুরোনো লোকরা বড় দূষিত মনের। কিন্তু এই ডাক্তারকে একদিন উচিত শিক্ষা দেবে বলে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল রেবেকা। তবে অপমান নয়। সেটা নিচু মনের লোকেরাই করতে পারে।

মাস কয়েক চলে গেল। রেবেকা ব্যস্ত ছিল কলেজের নানা রকম কাজের মধ্যে। এর মধ্যে দুটি মানুষ তার মনের ওপরে আধিপত্য বিস্তার করছেন। একজন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। অন্যজন বিখ্যাত জুতো কোম্পানির ডিপার্টমেন্টাল ম্যানেজার সেলিম আখতার। প্রিন্সিপ্যাল পড়াশুনো নিয়ে ব্যস্ত থাকার জন্য বিয়ে করার সময় পাননি। বয়স হয়ে গেছে চল্লিশের মতো। মোটা বেঁটে চেহারা। মাথার চুল পাতলা হয়ে গেছে। একদিন সিনেমা দেখতে নিয়ে গিয়ে আবেগের বশে রেবেকার হাত চেপে ধরেছিলেন। রেবেকা আলগা দিয়ে বসেছিল। হেসেছিল সে শুধু। মানুষটি মোটামুটি সরল। শিশুর

মতো তাকে জড়িয়ে ধরে ঘাড়ে গালে চুমু খেয়ে দিলে কৃত্রিম ক্রোধ দেখাতেই তিনি ভয়ে কাবু হয়ে ক্ষমা চাইতে চাইতে এক সময় কেঁদে ফেললেন। কিন্তু কদাকার পণ্ডিত মানুষটাকে রেবেকা কেমন করে মনের মানুষ করবে চিরকালের জন্য ! অর্থ-সামর্থ্যই কি সব ?

সেলিম সাহেব খুব ধারালো। ধারালো তাঁর চোখ মুখ। তেমনি পাকা ফর্সা। নীলাভ কিছুটা বুদ্ধিতীক্ষ্ণ কটা চোখ। ছ-ফুট উঁচু ঋজু চেহারা। একবার তিনি বিয়ে করেছিলেন। একটি বছর দশেকের মেয়ে আছে। ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে।

সেলিম সাহেব চান তাকে বিয়ে করতে। একদিন তার সঙ্গে বাড়িতেও এলেন মোটর নিয়ে। মা-বাবার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে আলাপ করলেন। জুতো কোম্পানীর লাইব্রেরীর ফাংশানে রেবেকা আমন্ত্রণ পেয়ে সেখানে ছাত্রাদের নিয়ে চিত্রাঙ্গদা নাটিকা পরিচালনার সময় ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ।

ভদ্রলোক তাঁর বাসায় নিয়ে গিয়ে একদিন কি ভীষণ ভাবে টানলেন। লজ্জা করে তার এখন সে সব ভাবতে।

কিন্তু মার হঠাৎ বুক ধড়ফড়ানির মাত্রা বেড়ে গেলে দীপুকে দিয়ে মাঝরাত্রে নিশীথ সেনকে ডাকতেই হল রেবেকাকে। বাবা গেছেন দিনের জন্য মিশনারীর আমন্ত্রণে বাইরে।

নিশীথবাবু এলেন।

রেবেকা বলল, মার হঠাৎ অসুখটা বাড়ল ; বাবা গেছেন বাইরে।

নিশীথবাবু রোগীকে দেখে গম্ভীর হয়ে প্রেসক্রিপসন লিখতে গেলেন। মায়ের কি রকম সঙ্কোচ এই ডাক্তারকে দেখে। হেনা সরকার তার ধারণাকে গোলমাল করে দিয়েছে।

অন্য ঘরে এসে নিশীথবাবু বললেন, 'রোগীর অবস্থা খুবই মারত্মক। বুকের নামকরা ডাক্তার দেখান।'

রেবেকা ভয় পেল, চিন্তিত হল। বলল, 'কি রকম মারাত্মক, আপনি যদি একটু খুলে বলেন। বসুন না।'

রেবেকার চোখের মধ্যে মিনতি। বসলেন নিশীথ সেন। বললেন,

'আসলে কি জানেন, বুক ধড়ফড়ানিটা প্রেসার এবং পেটের গ্যাস থেকে আসে। হার্ট দুর্বল হলে সেই চাপ হঠাৎ স্ট্রোক এনে দিতে পারে। তাছাড়া গ্যাসটিক আলসার এখন বোধহয়...'

'এখন বোধহয় ?'

'ঠিক আমি বুঝতে পারছি না। হাসপাতালে ভর্তি করে দিন মাসিমাকে।'

নিশীথবাবু উঠে পড়ে চলতে লাগলেন। ভিজিটের টাকা দীপুর হাতে দিলে রেবেকা। ডাক্তার তা না নিয়ে উল্টে বরং বড বড় চোখ বার করলেন।

অথচ রেবেকা কলেজে চলে গেলে রোজই মাসিমাকে দেখতে এসে নিশীথবাবু রেবেকার মাকে এ যাত্রায় সারিয়ে তুললেন। মা এখন নিশীথ সেনের সম্বন্ধে গদগদ। কারণ নচ্ছার হেনা সরকার ইতিমধ্যে কলোনী থেকে কোনো একটা গ্রাম্য বকাটে চাষীর ছেলের সঙ্গে পালিয়ে গেছে। মেয়েটা যে নিজেই মন্দ তা প্রমাণ হয়ে গেছে।

রেবেকা একদিন কলেজ থেকে ফিরে মার কাছে শুনল নিশীথবাবু নাকি খ্রীস্টান হবেন।

হাসল রেবেকা।

হঠাৎ একদিন প্রিন্সিপ্যাল সঙ্গে এসে হাজির।

দোকানে দীপুকে রেখে মিঃ চৌধুরী বাড়ি এলেন। প্রিন্সিপ্যালের মতো মানুষ যে তাঁর বাড়িতে আসবেন এটা বড় ভাগ্যের ব্যাপার বলে রজত চৌধুরী কত বিনয় সম্ভাষণে আপ্যায়িত করতে লাগলেন।

কিছু না, কিছু না— ব্যস্ত হবেন না, বলে মোটা বেঁটে প্রিন্সিপ্যাল হীরক নন্দী করজোড়ে ক্ষমা চাইতে লাগলেন। রেবেকার মা-বাবাকে প্রণাম করলেন। মিষ্টি চা দেওয়া হল। আড়ালে মা-বাবা দুজনেই বললেন, 'আরে ধ্যেৎ, এই রকম চেহারার লোক প্রিন্সিপ্যাল হয়।'

হঠাৎ কোম্পানীর মোটর নিয়ে সেলিম আখতার এসে হাজির। রেবেকা ডেকে নিয়ে গিয়ে আলাপ করে দিলে। সেলিম সাহেব পদ-মর্যাদায় যেন সব সময় সচেতন। তিন হাজার টাকা মাইনে পান।

মুখের চুরোট নামাননি। মসমস করে ঋজু হয়ে হাঁটেন। মা-বাবা আড়ালে বললেন, 'খাসা চেহারা তো!'

কিছুক্ষণ পরে যখন সেলিম সাহেব তাঁর বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা দিয়ে প্রিন্সিপ্যালের সব বিদ্যে-বুদ্ধিকে কোণঠাসা করে দিচ্ছিলেন আর তাঁর কদাকার চেহারাটি নিয়ে কৌতুক করছিলেন সাইকেলে চেপে এলেন ডাক্তার নিশীথ সেন। এসেই ডাকলেন, 'মাসিমা আছেন নাকি?'

'এসো বাবা!' রেবেকার মা হরিমতী চৌধুরী একটু বাইরে এসে ডাক দিলেন।

রেবেকা হেসে অভ্যর্থনা করল।

আলাপ হল পরস্পরের মধ্যে।

রেবেকা হাসতে হাসতে ভাবল তার কত ভাগ্য—তিন তিনটে বিয়ের উমেদার এখন তাদের বাড়িতে। কে এর মধ্যে সরেস! প্রিন্সিপ্যাল নন্দী ব্রাহ্ম। সেলিম মুসলমান। নিশীথবাবু হিন্দু। রেবেকা খ্রীস্টান।

চারজনে গল্পে মেতে গেলেন। বাবার পীড়াপীড়িতে দু-একটা গান গাইল রেবেকা। কনে দেখা হচ্ছে যেন!

ঘণ্টাখানেক পরে সবাই চলে গেলেন। প্রিন্সিপ্যালকে মোটরে চাপিয়ে নিয়ে গেলেন সেলিম সাহেব।

নিশীথবাবু সাইকেলে চলে গেলেন। রিকশায় বেশি পয়সা যায় বলে এখন তিনি সাইকেল কিনেছেন। পাড়াগাঁয়ে এটা ভাল।

রেবেকা একাই চুপচাপ থাকে। বিড়ালের মতো হামাগুড়ি দিয়ে বেড়ানো আকাশের সাদা মেঘের দিকে তাকিয়েই থাকে, কোনো অর্থ খুঁজে পায় না। মনে মনে কেবলই কাটাকুটি করে এঁদের মধ্যে কে ভাল?

প্রিন্সিপ্যাল তার চাকরির ক্ষেত্রে 'বস' বলে খাতির করতেই হয়। কিন্তু তাঁকে নিয়ে ক্লাসের মেয়েরা কত হাসাহাসি করে। ডাক্তার নিশীথ সেন যদি এফ. আর. সি. এস. হতেন! গ্রামের স্বাস্থ্য কেন্দ্রের একজন

সাইকেলে চড়া ডাক্তার যিনি খুনের কেসের রিপোর্ট লেখার জন্যে পঁয়ত্রিশ টাকা করে নিয়ে থাকেন, বাইরের রোগীও দেখেন যদিও দেখার আইন নেই—তাঁকে বিয়ে করবে ?

সেলিম সাহেব তাঁর মনের মধ্যে খেলা করতে লাগলেন। ভদ্রলোক সুন্দর দেখতে, সুন্দর চেহারা, অনেক টাকা মাইনে। ভাল সাহেব-কুঠিতে থাকেন। শুধু তাঁর একটি মেয়ে আছে!

একদিন প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'কি ঠিক করলে রেবেকা ? স্পষ্ট করে নির্ভয়ে বলো।'

আপনাদের ব্রাহ্ম সমাজে তো কত শিক্ষিতা সুন্দরী আছেন…'

'তার মানে তুমি রাজি নও।'

রেবেকা মাথা নিচু করে রইল।

'ঠিক আছে। আর কোনোদিন বলব না। আমি বিয়ে করব না। আচ্ছা, এসো তুমি।'

রেবেকার পায়ে হোঁচট লেগেছিল। ফিরতে ফিরতে ভাবছিল চাকরিটা সে ছেড়ে দেবে। এর পর ঐ কলেজে টিকে থাকতে হলে মিঃ নন্দীর বিরুদ্ধে একটি জোট হয়ে ক্রমাগত দ্বন্দ্ব করে বাঁচতে হবে। মিঃ নন্দী মেয়েদের ব্যাপারে যত সহজ সরল হন আসলে তিনি তত সহজ সরল নন। হলে প্রিন্সিপ্যাল হতে পারতেন না।

সেই দিনই ফেরার পর বাড়িতে এসে দেখল নিশীথ সেন একাই বসে আছেন বাইরে। কাগজ পড়ছেন। মা ভেতরে চা করছেন। রেবেকা ভাবল এঁর সঙ্গেও আজ একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলা দরকার। কাপড়-জামা ছেড়ে গা ধুয়ে চুল আঁচড়ে পরিপাটি হয়ে এসে বসল বাইরে। ডাক্তার বললেন, আজ আপনাকে ভারি ভাল দেখাচ্ছে।'

রেবেকা বলল, 'চাকরিটা ছেড়ে দিচ্ছি।'

'তাই নাকি ! কেন জানতে পারি কি ?'

'ভাল লাগছে না।'

মুখের দিকে নিশীথ সেন তাকিয়ে রইলেন। মাথা নাড়তে লাগলেন। যেন সব কিছু বুঝতে পেরেছেন। বললেন, 'বুড়ো জরদ-

গবটা বোধহয় বিয়ে করবার জন্যে চেপে ধরেছেন ?'

'অনেকেই চেপে ধরছেন এখন। অথচ ভাবছেন না আমি এটা পছন্দ করি কি না। আমি যেন বাবা-মাব গলগ্রহ হয়ে পড়েছি—তাঁরা উদ্ধার করতে আসছেন।'

'আমাকেও কি আপনি আশা ত্যাগ করে সরে যেতে বলছেন !'

'কেন আশা করছেন আমি ভাবতে পারছি না।'

'আপনি বিয়ে করবেন না ?'

'সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।' রেবেকা হেসে বললেও বোধ-হয় রূঢ় শোনালো তার গলার স্বরটা। তারপর সে যেন ঝোঁকের মাথায় বলে ফেলল, 'আমি একটু বেরুব এখন।' রেবেকা ঝড়ের মতন ঘরে ঢুকল আর ব্যাগটা টেনে নিয়ে ঝড়েব মতো বেরিয়ে যেতে দেখে হরিমতী শুধোলেন, 'কোথায় যাচ্ছিস এখন ?'

কোনো উত্তর দিল না রেবেকা।

ইতি সামনে পড়ল, বলল, 'কোথা যাবি এখন ?'

'মরতে।' বলে রেবেকা একটা চালু রিকশয় উঠে বসল। রাত তখন আটটা।

ইতি হাঁ করে রইল। ক্ষেপেছে নাকি মেয়েটা !

রেবেকার যেন তখন হুঁশ ছিল না। একটা ঘোর লেগেছে তার। দুটো নীলাভ পিঙ্গল চোখের তারা ক্রমেই যেন তার মনের পর্দায় বড় হয়ে উঠছে। তীক্ষ্ণ জ্যোতি বেরিয়ে আসছে তা থেকে। সম্মোহন বলে কোনো জিনিস আছে ?

দামী বুটের শব্দ করে দাপটে ভদ্রলোক এমন দাবড়ি মেরে পা ঠোকেন যে ভয়ে ডাক্তার প্রিন্সিপ্যাল বাবা সবাই কাবু হয়ে যান। অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সেলিম আখতারের। তিনি লণ্ডন নিউইয়র্ক মস্কো ঘুরে আসা লোক। পঞ্চাশ হাজার শ্রমিকদের চালাচ্ছেন, চাবুক হাতে নিয়ে নয়, হাসিখুশী দিয়ে, বুদ্ধি ফিকির করে। আলোচনায় বসে নানান সাংস্কৃতিকী করে। শ্রমিকরা তাঁকে ভালবাসে। যে কোনো শ্রমিকের কাঁধে হাত দিয়ে তিনি গেটের বাইরে পর্যন্ত চলে যান মোচার

ঘণ্ট আর শুকতোর তরকারী কত ভাল লাগে সে কথা বলতে বলতে। তবে তিনি কাজের বেলায় শক্ত মানুষ। সব কাজ হাতেনাতে জানেন। কারখানায় ঘুরতে ঘুরতে যার কাজে ভুল হচ্ছে দেখিয়ে দেন। বকেঝকে আবার তাকে আলিঙ্গন করে নেচে সবাইকে হাসিয়ে দিয়ে চলে যান। বাবুদের কিন্তু তিনি ভীষণ ডাঁটে রাখেন।

রেবেকা সোজা এসে ম্যানেজার কুটির কলিং বেল টিপল। আইগ্লাস দিয়ে দেখার পর সেলিম সাহেব বেরিয়ে এসে হঠাৎ জড়িয়ে ধরলেন রেবেকাকে ছেলেমানুষের মতো। বললেন, 'হুররে। জানতাম তুমি আসবে! চলো, লক্ষ্মীটি—এই ঘরে একটু বন্দী হয়ে থাকো। মিটিং চলছে। মালিক এসেছেন। বাবুরা আছে। শালা, লাইফটা হেল করে দিলে। টিভি দ্যাখো ততক্ষণ। চোপ, একদম কিচ্ছু শুনব না।' দোর এঁটে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন সেলিম আখতার।

রেবেকা খুশী হল। আরামদায়ক কোচে বসে পড়ে সে টেলিভিশন দেখতে লাগল। ওর মুখে পোশাকে কি রকম যেন একটা নেশা ধরানো উগ্র অথচ মিষ্টি গন্ধ। কত দামী আসবাব আর পর্দা ঘরে।

বেয়ারা কফি আর নানান ধরনের বিস্কুট কলা পনির চানাচুর ইত্যাদি দিয়ে বেরিয়ে গেল।

নাটক দেখানো হচ্ছিল টিভিতে।

নাটক শেষ হল যখন রেবেকার মধ্যে ভাবান্তর দেখা দিল। তার মতো একটি মেয়ে এক ধনীর সন্তানের ফন্দিতে পড়ে ফেঁসে গেল। মেয়েটি শেষ পর্যন্ত অনেক দূরের এক আশ্রমে জায়গা নিল।

দশটা বেজে গেল। বেরুতে চেষ্টা করেও পারল না রেবেকা। এ সে কি করল!

হঠাৎ সেলিম সাহেব দোর খুলে ভেতরে এসে বললেন, 'ক্ষমা চাইছি। মিটিং শেষ হতে দেরি হয়ে গেল। মালিক বলেন আপনি শ্রমিকদের অত আস্কারা দেন কেন? ওরা আপনাকে মানবে না। পেয়ে বসবে। শালা আমি যেন অতই বোকা। ভদ্রলোকের দিকে বাঘের মতো কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকতেই তিনি কাবু হয়ে গেলেন।

বললেন, অবশ্য আপনি যেমন ভাল বোঝেন চালান ; ভেবেছেন আমি যদি তাঁর বিরুদ্ধে শ্রমিক ক্ষেপাই।'

রেবেকা বলল, 'আজ আর কোনো কথা হবে না—দেরি হয়ে গেছে। রাগ করে কোথায় যাচ্ছি, না বলেই চলে এসেছি।'

'কেন রাগ কিসের ?' হাত দিয়ে বেড় দিলেন সেলিম সাহেব। বললেন, 'চল তবে পৌঁছে দিই। যেতে যেতে কথা হবে।'

রেবেকা যেন কৃতজ্ঞতায় গলে গেল।

এক পেগ ব্রাণ্ডি এনে খাইয়ে দিলেন তাকে সেলিম সাহেব। খ্রীস্টান মেয়ে সে, বড়দিনে কতবারই মদ খেয়েছে।

পথে মোটর ছুটেছে।

রেবেকার মাথা ঝিমঝিম করছিল। কখন তার মাথাটা সেলিম সাহেবের কাঁধের পাশে পড়ে গিয়েছিল হুঁশ ছিল না।

তাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে সেলিম সাহেব গাড়িতে উঠে বলতে লাগলেন, 'হঠাৎ উনি গেলেন, মিটিং চলছিল আমার। ওকে অস্থির দেখে একটু ব্রাণ্ডি খাইয়ে দিয়েই নিয়ে চলে এসেছি। ওকে আজ ঘুমোতে দিন।'

হরিমতী বললেন, 'বেশ করেছ বাবা, ওর কি যেন হয়েছে আজ, বললে চাকরি আর করবে না।'

'আমি চাকরি দেবো।' বললেন সেলিম সাহেব।

মোটর বেরিয়ে গেল তাঁর।

রজত চৌধুরী মেয়ের ওপরে ক্ষুণ্ণ হলেন খুব। স্ত্রীকেও বকাবকি করলেন। বললেন, 'ওর আর বাইরে গিয়ে কাজ নেই। ছোটবেলা থেকে ওকে তুমি আস্কারা দিয়ে মাথায় তুলে এরকম করেছ। মেয়ে মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে বাড়ি ফিরবে আর অন্য লোক তাকে মাঝরাতে দিয়ে যাবে এ ঘটনা কি বাঙালী সমাজে সাধারণ ব্যাপার ? অতবড় একজন কারখানার ম্যানেজার আমার মতন সামান্য লোকের বাড়িতে কেন আসেন সেটা কি লোকে বোঝে না ?'

হরিমতী চুপ করে রইলেন মেয়ের পাশে বসে। কি হয়েছে ওর

তিনিও ভেবে পেলেন না। কি জানি কি ঘটিয়ে এসেছে, পরিণাম কি হবে সেই ভেবে মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলেন।

সকালে হুঁশ হতে রেবেকা দেখল তার মাথা ধরেছে খুব। রগ দুটো টনটন করছে।

মা তার মাথায় হাত বুলোলেন। বললেন, 'কি হয়েছে তোর বল। নিশীথকেও তাড়ালি, কলেজে কিছু হয়েছে?'

'সেই কদাকার আধবুড়ো প্রিন্সিপ্যাল আমাকে বিয়ে করতে চান। আমি সাফ জবাব দিয়েছি, হবে না। নিশীথবাবুকেও।'

'তাহলে সেলিম সাহেবকে কি তুই বিয়ে করবি? উনি রাজি হবেন? না, খেলাচ্ছেন শুধু?'

রেবেকা কিছু বলল না।

দুটো শালিক রোদে বসে ঝগড়া করছে।

'তাই যদি হয় তোকে মুসলমান হতে হবে না?'

'সভ্য জীবনে এসব কোনো সমস্যা নয় মা। সামাজিকতার চাপ সেলিম সাহেবের কাছ পর্যন্ত বোধহয় বেশি পৌঁছয় না।'

'এসব তোর ভুল, একজন বাদশা বা প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত এসব ক্রিয়াকর্মে রেহাই পান না। যাই হোক, তুই ভেবে দেখ্।'

কয়েকদিন আর কলেজে গেল না রেবেকা। বাড়ি থেকে বের হল না। বইপত্র পড়ল শুয়ে বসে। ইতিদের বাড়ি থেকে একদিন সেলিম সাহেবকে ফোন করে জানতে চাইলে খবরাখবর।

সেলিম সাহেব বললেন, 'আমাদের কারখানার যেসব মাল বিদেশে যায় তার অর্ডার দেওয়া-নেওয়া, চিঠি লেখা, হিসেব-পত্র অর্থাৎ করেন ট্রেডিংয়ে একটা পদ খালি আছে, তুমি চাকরিটা চাইলে একটা দরখাস্ত দিয়ে দাও।'

'ইন্টারভিউ আপনি নেবেন, না আপনার মালিক মিঃ আগরমল?'

'মালিক বেশি লেখাপড়া জানা লোক না, কিন্তু ব্যবসায় বুদ্ধি আছে। তুমি আসবে নাকি আজ? দেখ আমার যাওয়াটা কেমন যেন লাগছে—মেহমানপুরের মোড়ের বখাটে মুসলমান ছোঁড়াগুলো আমার

হাতে গুলি খেয়ে মরবে। আমি মুসলমান ম্যানেজার বলে তারা চাকরি চায়। সেদিন রাত্রে তারা গাড়ি আটকে আমাকে শাসিয়েছিল। তাদের চাকরি না দিলে নাকি বোম মেরে উড়িয়ে দেবে। ও.সি কে বলতে তিনি ওয়াচ করে কয়েকজনকে খুব ধোলাই দিয়েছেন। কাজেই ওই মোড় দিয়ে আমি এখন আর যাচ্ছি না—তবে তুমি যদি অসুস্থ হও বডিগার্ড নিয়ে যেতেই হবে।'

রেবেকা জানাল, না, সে নিজেই যাবে। তবে সেও ওই মোড়টা দিয়ে যেতে-আসতে ভয় পায়। আর ডাক্তারকে আশাভঙ্গ করার জন্য হয়তো তিনিও পয়সা খাইয়ে কিছু বদনাম হবার মতো দুর্ঘটনা ঘটাতেও পারেন।

'ঠিক আছে, আমার গাড়ি আর গার্ড যাবে, তুমি বিকেল চারটেয় এসো। কলকাতায় যাবো।'

ইতি খুব খুশী। বন্ধুর ভাগ্যে সে ঈর্ষান্বিতা। দুপুর গড়ালো। বিকেল এলো। অপেক্ষার সময় যেন ফুরোতে চায় না। সেজেগুজে তৈরি হয়ে রইল রেবেকা।

সবুজ মোটরটা একসময় এসে হাজির হল। ড্রাইভারের পাশে একজন বন্দুক নিয়ে বসে আছে। দীপুকে সঙ্গে দেবে কিনা না মা জানতে চাইলেন। রেবেকা দ্বিধা করল। তারপর বলল. না।

সেলিম সাহেব রেবেকাকে কলকাতায় নিয়ে যাবার পর নাখোদা মসজিদের ইমামের সাহায্যে ইসলামী মতে তাকে সাদি করলেন।

পরদিন প্রীতিভোজ দিলেন বাবু স্টাফের সবাইকে আমন্ত্রণ করে।

রেবেকা খুশীতে ডগমগ। বাবা-মাও এসেছেন কিন্তু দীপু আসেনি! সে নাকি কাঁদছে। কেন তা কিছু বলছে না। দিদি ধর্মত্যাগ করেছে বলে তাকে লেগেছে? ঐ বয়সে একটু কাঁচা উচ্ছ্বাস থাকে বটে।

কিন্তু সেলিম সাহেবের মেয়ে লায়লা খুব খুশী। সে রেবেকাকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'তুমি আমার মা? এতদিন কোথায় ছিলে?'

রেবেকা বলে, 'ঐ অন্ধকারে।'

সন্ধ্যা সমাগত। শীতে হাড় কাঁপছিল। তার ওপরে জ্বর। পা দুটো ফুলে গেছে। আর হাঁটতে পারছিলেন না ইন্দ্রনীল। পাহাড়ী উতরাইয়ের মধ্যে কেবলই বনজঙ্গল। কিছু দূরে থাক-থাক জমি কেটে চাষ-আবাদ করা হয়েছে। আশা করেছিলেন কাছেই কোথাও পল্লী আছে। বহু নিচে শতদ্রুর খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত একটা বাড়ির সন্ধান পেলেন ইন্দ্রনীল। কাঠের বাড়ি। প্যাগোডা ধরনের। ভেতর থেকে বন্ধ। পিঠের হাতের সমস্ত লগেজ নামিয়ে ফেলে বাইরের বারান্দাটাতেই শুয়ে পড়তে ইচ্ছে হল তাঁর। কিন্তু ভীষণ কনকনে হাওয়া বইছে। কুয়াশায় চারদিক ঢেকে আসছে। কড়া নাড়লেন ইন্দ্রনীল। নাড়তেই থাকলেন কিছুক্ষণ ধরে। কারো সাড়াশব্দ নেই। ভেতরে যদি লোকজন থাকে তো বোধ হয় তারা মারা গেছে।

কম্বল মুড়ি দিয়ে কুকুরকুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়লেন ইন্দ্রনীল। শরীর কাঁপছিল তাঁর। কিছুক্ষণের মধ্যে চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল বোধ হয়। শুধু মনে পড়ছিল ঃ তিব্বতের বিম্বিসার প্যাগোডার মধ্যে মোমবাতির সামনে বসা বৌদ্ধ ভিক্ষুনী শ্রাবন্তীর মুখটা। সামনে তাঁর কয়েক হাজার বছরে ধর্মীয় আখ্যানের এক পুঁথি। তার কাহিনী তিনি শুনছেন আর লিপিবদ্ধ করছেন। চ্যাপ্টা মুখ, নরুণ-চেরা চোখ, মিহি গলার স্বর—বয়সে আছে স্থির যৌবন—এক মাস তার সান্নিধ্যে থেকেছেন প্রতিদিন প্রায় ছ ঘণ্টা—মহাগ্রন্থের পবিত্র কাহিনী আর স্পর্শের মধ্যে ইন্দ্রিয়গুলো তখন ছিল কেমন পোষা বিড়ালের মতো…

কাদের ডাকাডাকি টানাটানিতে যেন চেতনা ফিরল ইন্দ্রনীল সাংকৃত্যায়নের। দেখলেন আলোর সামনে এক বুড়ো। আর এক তরুণী।

বুড়ো বলল, 'ভেতরে এসো। কোত্থেকে আসছ?'

'তিব্বত থেকে। যাব দিল্লি। আমি একজন ভ্রমণকারী।'

'চম্বলের ডাকাতদের দল চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আমরা ভয়ে সন্ধ্যার পর আর বেরুই না। মনে হচ্ছে তুমি অসুস্থ।'

'পথশ্রান্তিতে এমনি একটু জ্বর হয়েছে।'

ছোট্ট একটা কাঠের ঘরের মধ্যে তক্তপোশের ওপরে গরম কম্বল লেপ মুড়ি দেবার ব্যবস্থা করে দিল তরুণীটি। গরম দুধ খেতে দিল। ট্যাবলেট গিললেন ইন্দ্রনীল। পাইপ টানতে টানতে বুড়ো গল্প করতে লাগল। মেয়েটা তার নাতনী। এক ছেলে পশমী জামা-কাপড়ের দোকান করে সিমলাতে। সেখান থেকে সে দিল্লি, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ কত জায়গায় চলে যায়। বুড়োর কিছু চাষ আবাদ আছে। ভুট্টা যা হয় সম্বৎসর চলে যায়। নানা রকম ফলও হয় তাদের। বুড়ী মারা গেল গত বছর। নাতনী সিমলার এক হস্টেলে থেকে বি.এ. অনার্স পাস করে এসে এখানের একটা স্কুলে নতুন মাস্টারী পেয়েছে। ও নাকি বড় লাজুক। আর এক নাতি আছে, বাপের সঙ্গে থাকে, তার পড়াশুনো তেমন হল না।···ছোট দুই ভাই-বোনকে রেখে ওদের মাও মারা গিয়েছিল—বুড়ীই মানুষ করেছিল ওদের···সেও চলে গেল···

বুড়োর নাতনীর নাম নাকি লাজবতী। তিব্বতী, হিন্দী, নেপালী মেশানো এক ধরনের পাহাড়ী ভাষায় দেহাতী লোকেরা কথা বলে, কিন্তু লাজবতী ইংরেজিতে শুধোলে, 'রাত্রে আপনি কি খাবেন?'

'আমার জন্য ব্যস্ত হবেন না। বিস্কুট আছে আমার কাছে। জ্বর মতো আছে। একবার পড়ে গিয়েছিলাম।'

গরম দুধ আর ট্যাবলেট খাবার পর শরীর গরম হয়ে গেছে। ব্যাগ-ব্যাগেজ খুলে টেপ রেকর্ডার, পকেট রেডিও, ক্যামেরা, বইপত্তর, হাতঘড়ি, পেন-পেনসিল, নানা রকম মণিমুক্তা, রূপোর চাকতি বসানো হাড়, বিস্কুট, কাজুবাদাম, সল্টেড বাদাম, টর্চ, ওষুধপত্র, পাথরের পুতুল ইত্যাদি বার করে ফেলে রাখলেন।

বললেন, 'লাজবতী, আপনি কি বাইরের বইপত্তর পড়েন?'

'খুবই সামান্য। আপনি কি আগুনের কাছে যাবেন?'

'দরকার হবে না বোধ হয়।'

লাজবতী চলে গেল।

মাথা গুঁজে পড়ে ছিলেন ইন্দ্রনীল। ভাবছিলেন আজ কত তারিখ—কবে পর্যন্ত তিব্বতী মহাকাব্যের আখ্যানমূলক কাহিনীটি তিনি দিল্লির বিখ্যাত এক প্রকাশককে লিখে দিতে পারবেন। তিব্বতে যাওয়া আসা খাওয়ার খরচ তাঁরাই দিয়েছেন। গোটা কাহিনীটি চার খণ্ডে বিভক্ত। তিন ভাগ রেকর্ড করার পর টেপ ফুরিয়ে গেল। তিব্বতী ভাষা জানতেন বলে চতুর্থ ভাগের কাহিনীর নোট নিয়েছেন তিনি।

টেপ রেকর্ডার চালিয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুনীর কাব্যপাঠ শুনতে লাগলেন।

সেই কণ্ঠস্বর শুনে লাজবতী আর ঠাকুরদা মঙ্গৎরাম এলো। তারা বিস্মিত। শ্রদ্ধাভরে বসে শুনতে লাগল। ইন্দ্রনীল বুঝলেন, তিব্বতী লামাদের ভাষা এরা ভালই বুঝতে পারবে। বৌদ্ধ জাতক কাহিনীর মতোই এ কাহিনী চমকপ্রদ।

ভেতরে মোটা মোম জ্বলছে।

লাজবতীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলে সে লজ্জায় অধোবদন হয়ে থাকে। চোখে চোখ পড়লে মিষ্টি হাসে। অতিথি যে চোর ডাকাত নন, পণ্ডিত জ্ঞানী মানুষ এটা বোধ হয় বুঝেছে।

একসময় সে ভেড়ার ঘি মাখানো রুটি আর কিসমিস, আপেল, নেশপাতি, বাদাম ইত্যাদির মণ্ড এনে দিল।

মঙ্গৎরামের অনুরোধে খেলেন ইন্দ্রনীল। রাত দশটার পর কাব্য-পাঠ বন্ধ করে দিয়ে ওদের শুতে যেতে বললেন।

মঙ্গৎরাম বলল, 'বাবুভাই, গোস্তাকি নিও না, আমি মূর্খ অধম এক বৌদ্ধ চাষী। নাতনী বলল, তুমি নাকি খুব বিখ্যাত লোক। তোমার লেখা বই কিতাব আছে।'

ইন্দ্রনীল চোখ মিটমিট করে হাসলেন। চল্লিশের মতো তাঁর বয়স।

এই বয়সেই তিনি প্রায় চৌত্রিশটা ভাষা জানেন। সমস্ত ভারতীয় ভাষা তো বটেই, চীনা, রুশ, জার্মান, ল্যাটিন, হিব্রু পর্যন্ত। লাজবতীকে বললেন, 'আমার বই কিছু পড়েছ ?'

লাজবতী হেসে খুশী হয়ে মাথা নাড়ল। খানচারেক বইয়ের নাম বলল সে। বলল, 'হস্টেলে বৌদ্ধ ভিক্ষুণীরা আমাদের আপনার বই পড়তে দিতেন। তাঁরা বলতেন, সর্বধর্ম গুলে-খাওয়া আপনি নাকি এক বৌদ্ধ পণ্ডিত। বই পড়ে আপনার বয়স এত কম হবে ভাবি নি।'

'কত ভাবতে তবু ?' কৌতুক বোধ করলেন ইন্দ্রনীল।

'আশী তো বটেই, সাদা চুল, সাদা পোশাক, এক শ্রমণ প্রাজ্ঞ পণ্ডিতের মতো !'

হা হা করে হাসতে লাগলেন ইন্দ্রনীল।

এমন প্রাণবন্ত উদার হাসি যে মানুষ হাসতে পারেন লাজবতী তা কখনো দেখেনি। যত শিক্ষিত জ্ঞানী ব্যক্তিদের সে দেখেছে তাঁরা অধিকাংশই গম্ভীর আব অহংকারী যেন। সাধারণ মানুষদের তাঁরা মানুষ বলেই গণ্য কবেন না।

সকাল হল শীতকালের মেঘ বৃষ্টি আর ঝড়ঝাপটা নিয়ে। প্রচণ্ড গর্জন তুলে মেদিনী কাঁপিয়ে বাজ পড়তে লাগল পর্বতের চূড়ার ওপরে।

লাজবতী চা নিয়ে এলো। সঙ্গে মশলা মাখানো ভুট্টার খই।

'বাইরের আবহাওয়া বড় খারাপ, না লাজবতী ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি আর আজ স্কুলে যাব না। বিরিয়ানী পোলাও মুরগীর মাংস রান্না করব আর আপনার গল্প শুনব।'

'ঠাকুরদা ওঠেননি ?'

'আজ আর উঠবে না। বাতে ধরেছে। শুয়ে শুয়েই খাবে বুড়ো।'

'বুড়ো বড় ভাল লোক, কিন্তু তুমি একা থাকবে কেমন করে ?'

লজ্জা পেল লাজবতী। বলল না কিছু।

'কেউ ঠিক করা আছে নাকি ?'

'যান ! আপনি বড় লজ্জা দেন !'

'শোন শোন—এদিকে এসো।'

লাজবতী ফিরল।

'এই মুক্তোর মালাটা তোমাকে দিলাম।' গলায় পরিয়ে দিলেন ইন্দ্রনীল। চিবুক ধরে মুখটা দেখলেন। বললেন, 'এবাব বড় চমৎকার দেখাচ্ছে।'

লাজবতী হাঁটু গেড়ে বসে প্রণত হল।

ইন্দ্রনীল তাকে আদর করে তুলে দিলেন।

ঝড়বাদলের পর বরফ পড়তে শুরু করল। বাইরে এখন বেরুনো শক্ত। গোটা পাহাড়ী এলাকার মানুষরা এখন ঘরের মধ্যে পশমী কাপড় বোনা আর কাঠের ওপর নক্‌শার কাজ করতে লেগে গেছে।

ইন্দ্রনীল দেখলেন যাওয়াই যখন যাবে না তখন লেখার কাজ শুরু করাই ভাল। তিনি ছক আঁকতে লাগলেন। চরিত্রগুলোর নাম লিখলেন। পটভূমির ছবি আঁকলেন। এসব তাঁর মনে রাখার জন্য। প্রথম দিনটা তাঁর এইরকম মনস্থ করতেই কাটল। দ্বিতীয় দিনে লেখা শুরু করলেন।

মাঝে মাঝে চা আনে লাজবতী। বাধ্য মেয়েটি। আদর করে কাছে টানলে পোষা বিড়ালটির মতো গায়ে গা চেপে গরগর করে।

সন্ধ্যার পর ঝোড়ো বাতাস বইতে লাগল। আর প্রচণ্ডরকম ঠাণ্ডা। হাত-পায়ের আঙুল প্রায় অবশ হয়ে গেল। ঘরের মধ্যে আগুনের ব্যবস্থা করল লাজবতী।

পেটা শিশির ভেতর থেকে উগ্র গন্ধযুক্ত কি যেন ওষুধ খেলেন ইন্দ্রনীল। নিজে গিয়ে বুড়োর লেপ-কম্বল খুলে তাকেও খানিকটা খাওয়ালেন।

'তুমিও একটু খাবে লাজবতী ?'

'কি জিনিস ?'

'যে পানীয় পান করলে জমাট রক্ত তরল এবং উষ্ণ হয়, অবসন্ন

ক্লান্ত স্নায়ু তেজদীপ্ত, শক্তিশালী হয়। মেধা ইন্দ্রিয় অত্যন্ত সচেতন ও সক্রিয় হয়!'

লাজবতী হাসতে হাসতে মুখ আড়াল করল।

কাছে এসে পাশে বসে ইন্দ্রনীল লাজবতীর মুখে ধরলেন তরল পানীয়ের পাত্রটি।

লাজবতী খানিকটা না-না করল। নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে গেল। কিন্তু তাতে যেন আরো নিবিড় হয়ে পড়ল। চোখমুখ বিকৃত করে ওষুধটি গলাধঃকরণ করল। তার মুখবিকৃতি দেখে খুব কৌতুক বোধ করলেন ইন্দ্রনীল।

'তবে শোন এক ফিরিশতার কাহিনী···' বলে ইন্দ্রনীল লাজবতীকে দু'হাতে কোলের ওপরে টেনে নিয়ে গল্প বলতে শুরু করলেন।

লাজবতী উত্তেজিত হয়ে উঠতেই একসময় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'দাঁড়ান একটু—দাদুকে দেখে আসি ···'

ইন্দ্রনীল আবার লেখায় হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু মনটা আজ হঠাৎ যেন যৌবনের ফুল ফুটিয়ে দিয়ে চারদিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে চাইছে। কোনো কাজ নয়। কোনো ভাবনা নয়। এমন মুহূর্ত জীবনে বড় বেশী আসে না। সংসারে অনেক সুন্দরী গুণী রমণী আছে, কিন্তু সবাই তারা লাজবতী নয়···

লাজবতী প্রেমের এক পুতুল।

ভেবেছিলেন ও আর বোধ হয় এখন আসবে না। কিন্তু লাজনম্র হাসি নিয়ে আবার এলো ও। বলল, 'দাদুর নাক ডাকছে।'

'এমন সরল সত্য কথা তো নারীস্বভাব বলে না সখি!'

'মিথ্যা আমি বলি না।'

'তাহলে তোমার হৃদয়ের অনুভূতির কথা আমাকে বলবে?'

'বলতে পারি না। শুধু মনে হয় ঐ মোমবাতিটার মতো আমি যেন জ্বলতে জ্বলতে ঝরে গলে যেতে চাই।'

'আমার এই বয়স, জুলপির চুলে পাক ধরেছে···'

মুখে হাত চাপা দিল লাজবতী। বলল, 'লেখক আর দেবতার

কোনো বয়স নেই।'

'লাজবতী!'

'বলুন।'

'তোমার চিকুরে, বাহুমূলে, পদমূলে, এ কিসের সৌরভ?'

'যৌবনের।'

'লাজবতী!'

'বলুন।'

'প্রতি রোমকূপে এত শিহরণ, তবে এর মধ্যে পাপ কোথায়?'

'জানি না।'

'রহস্যময়ী, জানো তুমি। আতঙ্কিত হবার ভয়ে স্বীকার করো না। এ হল সৃষ্টির আদিম রহস্য!'

'পারে না মানুষ একে এড়াতে?'

'মানুষ কেন, জীবজগতের কেউ না।'

'কিন্তু হে আর্য, হে ঋষি, এই সুখের পরিণাম? আমি যদি মা হয়ে যাই? অভাগিনী নিবেদিতার প্রেমের ঋণ কি কানাকড়িও পাব না?'

'আমরা ভবিতব্যের হাতের পুতুল। পরিণাম-ফল আমরা জানি না। সংযমের বাঁধ ভেঙে আমরা আদি রিপুর অরণ্যে প্রবেশ করেছি। চিরকালীন রীতি অনুসারে আমরা অবৈধ কাজ করেছি—একে যখন ঠাকুরদা বা লোকচক্ষুর কাছ থেকে গোপন করছি তখন অসামাজিক অন্যায়, কিন্তু আমরা দুজনেই তো সজ্ঞান, কে আমাদের বোঝাবে?'

'ভয় নেই ঋষি, আমি আপনার জ্ঞানতাপস জীবনে ক্ষতচিহ্ন আঁকব না।'

লাজবতীর সারা মুখ রক্তিম হয়ে উঠেছিল আর স্ফুরিত অধর দুটি কামনায় কাঁপছিল।

'কি করে বুঝলে যে আমার দ্বারা এ রকম একটা পরিণতি ঘটতে পারে?'

'আপনার চোখ বলে দিয়েছিল, স্পর্শ, আদর! আর আমি

নিজেও হয়েছিলাম মুগ্ধ, বিহ্বল। এ জিনিস আমার জীবনে একেবারে নতুন!'

'লাজবতী!'

'বলুন।'

'এখন আমাকে শ্রদ্ধা করতে পার?'

'হ্যাঁ নিশ্চয়ই, আরো গভীরভাবে। যাকে শ্রদ্ধা করতে না পারলাম তাকে কি হৃদয় নিবেদন করা যায়?'

একদিন দুদিন করে দশদিন কেটে গেল। লেখায় নেমে পড়েছেন ইন্দ্রনীল। তাঁকে দেখতে এসেছেন স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী। ফুলের মালা দিয়ে গেছেন। তাঁর সেবাব জন্যে ছুটি পেয়েছে লাজবতী। গ্রামের লোকেরা প্রথমে হাসাহাসি, গা-টেপাটেপি করেছিল। তাদেব এক সন্ধ্যায় আমন্ত্রণ করল লাজবতী। ধর্মকথা শোনালেন ইন্দ্রনীল সাংকৃত্যায়ন। সবাই প্রণিপাত করে চলে গেল। তারপর নানা বাড়ি থেকে উত্তম আহার্য আসতে লাগল। প্যাগোডার প্রধান ভিক্ষু এসে বললেন, 'আপনার পদধূলি পড়াতে এই অঞ্চল ধন্য। যদি আপনি এখানে থেকে যান, তবে আপনার সেবার ক্রটি হবে না।'

লাজবতী খুশীতে আত্মহারা। অহেতুক দাদুকে জড়িয়ে ধরে লুটোপুটি করে। কাতুকুতু দিয়ে তাকে জ্বালাতন করে মারে। বুড়ো মঙ্গৎরাম বলে, 'দাঁড়া রে শয়তানী, তেরিয়া একটা মরদ এনে না দিলে তুই জব্দ হবি না।'

'দাদু তুমিই তো আমার বর, তোমার গলা জড়িয়ে ধরে এক বিছানায় শুই না?'

ওদেব খুনসুটি দেখে আমোদ পান ইন্দ্রনীল।

বুড়ো পাইপ টানতে টানতে গাঁইতি কাঁধে নিয়ে ক্ষেতের কাজে বেরিয়ে যায়।

লাজবতী সুখে লাস্যে, নিবিড় যৌবন-আবেদনে অনবদ্য হয়ে ওঠে।

ইন্দ্রনীল ভাবেন, তাঁরও একসময় যৌবনকাল গেছে। অভাব ছিল,

ছিল সে-সময় অধ্যয়ন বা জ্ঞানান্বেষণের সময়। বিয়েও করেছিলেন তিনি, কিন্তু স্ত্রী ভরণপোষণ, সংসারের সুখশান্তির খোঁজে একদা নিশীথে তার আগের প্রেমিকের সঙ্গে চলে গেল। দু'বছরের একটি শিশুকে সে ফেলে রেখে গিয়েছিল। শিশুটিও মায়ের জন্যে কেঁদে কেঁদে তাকে খুঁজে খুঁজে একদিন উঁচু বারান্দার ওপর থেকে পড়ে গিয়ে মারা গেল। তখন তিনি তাঁর সব চাইতে বিখ্যাত বইটি লিখছিলেন। ওসব কথা মনে পড়লে মনটা কান্নায় ভিজে ওঠে তাই আবার ভালবাসার ফাঁদে বন্দী হতে নানারকম ভয়, আতঙ্ক···

'এবার যে আমার যাবার সময় হল লাজবতী!'

'আপনি দাদুকে টাকা দিয়েছেন?'

'দেব না? যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তার উচিত যতদিন অতিথি আদর-আপ্যায়ন পাবার অধিকারী, ততদিন তাকে সম্মান করা।' জিজ্ঞাসা করা হল, 'ওর সীমা কি (অর্থাৎ কতদিন)?' রসুলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, 'এক দিন এক রাত। তিন দিন পর্যন্ত আপ্যায়নের ব্যবস্থা যথেষ্ট হবে। এর অধিক অপেক্ষা করলে, অতিথির জন্য ব্যয় করা তখনকার পানাহার দান খয়রাতের ন্যায় গণ্য হবে। আর (অতিথির পক্ষে) অতিরিক্ত এতদিন থাকা উচিত হবে না যাতে গৃহস্বামীর কষ্ট হয়।'

'তার মানে আপনি এখনো আমাদের অতিথি আছেন?' বলল লাজবতী।

'তবে কি?'

'অশ্লীল একটা মন্তব্য করতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে।'

'কোরো না, লক্ষ্মীটি! আজই আমি চলে যাচ্ছি যখন

'না কিছুতেই না।'

'বা রে! তাহলে তুমি আমার সঙ্গে চলো। মাস্টারী ছেড়ে দিয়ে আমার সেক্রেটারীর কাজ করবে?'

'তাহলে তো বর্তে যাই, কিন্তু বুড়োটাকে কে দেখবে?'

'তার আগে বলো উনি গত হলে তোমাকে দেখবে কে? সন্ধ্যার

পর তো আর চম্বলের ডাকাতদের ভয়ে বের হও না।'

লাজবতী কিছুই বলে না। শুধু পাহাড়ীমেষের দিকে তাকিয়ে তার পরিপূর্ণ গোলাপগণ্ড বেয়ে চোখের জল নামে।

পরদিন সকালে টাঙ্গায় চড়ে বিদায় নিলেন ইন্দ্রনীল। পল্লার সবাই তাঁকে বিদায় জানাতে এসেছিল।

লাজবতী হাতের রুমাল নাড়তে নাড়তে হাসিমুখেই বার বার চোখের জল চেপেছিল। মঙ্গৎরাম হাত চেপে ধরেছিল, 'বাবুভাই, আর হয়তো দেখা হবে না।'

হেসে আশ্বাস দিয়েছিলেন ইন্দ্রনীল, 'হবে, আবার দেখা হবে।'

কাশ্মীর দিল্লি বোম্বাই পুণা কলকাতা করে কর্মস্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়ে দুটো বছর কোথা দিয়ে কেমন করে যেন কেটে গেল ইন্দ্রনীলের, সময় হযনি লাজবতীর খোঁজ খবর নেবার। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে তার। ঠিকানাও পায়নি লাজবতী।

অকস্মাৎ একদিন পাটনায় পাহাড়ী দুই বাপ-বেটাকে গরম জামা-কাপড় ফেরি করে বেড়াতে দেখে ইন্দ্রনীল থমকে দাঁড়ালেন। ছেলেটির মুখে অবিকল লাজবতীর ছাপ। এ তার ভাই না হয়ে যায় না।

জামাকাপড় কেনার ছল করে তিনি কোথায় বাড়ি কি নাম সব পরিচয়ই পেলেন। লাজবতীর বাপ আর ভাই ই এরা।

বললেন, 'তোমার দাদু কেমন আছে লালভাই?'

'ও বুঢ্‌ঢা গড়পর চলা গেয়া।'

'আর লাজবতী?'

চোখ কোঁচকালো লাজবতীর বাবা। বলল, 'এদিকে একবার আসুন তো বাবু।'

হাত ধরে টেনে নিল লাজবতীর বাপ। হিংস্র দৃষ্টি। কুটিল রেখা মুখভর্তি। বলল, 'আপনি তিব্বত থেকে ফেরার পথে এগারো দিন আমাদের বাড়িতে ছিলেন বাবু?'

'হ্যাঁ। কেন বলো তো, কি হয়েছে?'

'শিক্ষিত জ্ঞানী লোক হয়ে একটা উদোম বাড়ির মান-ইজ্জৎ নষ্ট করে দিয়ে চলে এলেন? লাজবতীর মুখ দেখানো দায় হয়ে গেল! তাকে ক্লিনিকে নিয়ে যেতে চাইলাম, সে গেল না। তাকে চাবুক মারলাম—তবু সে বাঁকল না। সে বলেছিল ঋষির সন্তানকে আমি হত্যা করতে দেব না। তুমি ঋষি? কপট! ভণ্ড!'

গম্ভীর হয়ে রইলেন ইন্দ্রনীল। একসময় বললেন, 'লাজবতী এখন কোথায়?'

'সে এখন তার ছেলেকে পিঠেবেঁধে নিয়ে গিয়ে তিব্বতের বিম্বিসার প্যাগোডার সেবিকা হয়ে আছে।'

লাজবতীর বাপের ঘৃণাভরা চোখের দিকে তাকানো যায় না। তার দিকে পিছন ফেরাও এখন যেন কত লজ্জার!

ইন্দ্রনীল বললেন, 'আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। লাজবতীকে আমি ফিরিয়ে আনব দিল্লিতে। কালই আমি রওনা হয়ে যাচ্ছি।'

হঠাৎ কেঁদে ফেলে হাত চেপে ধরল লাজবতীর বাবা। বলল, 'যাও বাবা। আমার কচি কোমল মেয়ে। সুখের পায়রা ছিল। তাকে আমি কত চাবুক মেরেছি! এই নাও চাবি…'

ঘুন্‌সি থেকে একটা বড় মোটা চাবি খুলে দিল লাজবতীর বাবা। বলল, তিব্বত থেকে লাজবতীকে নিয়ে ফেরার পথে ডহরা পল্লীতে ভগৎরামের বাড়িতে কিছুদিন থেকো তোমরা। আমার মান বাঁচবে। মাসখানেকে মধ্যেই আমরা ফিরব।'

'আচ্ছা।' বলে বিনয় সম্ভাষণ জানিয়ে লালভাইয়ের পিঠে চাপড় মেরে চলে এলেন ইন্দ্রনীল।

ট্রেন চলেছে। চাবিটাকে ইন্দ্রনীল কেবলই শুধু দেখছেন।…

আবার চড়াই-উৎরাই পথ। দুর্বার হিমালয়। আবার সেই বিম্বিসার প্যাগোডা। যার ভেতরে দীর্ঘ এক মাস ধরে বসে বসে বৌদ্ধ ভিক্ষুণীর পাশে জাতক মহাকাব্যের কথিকা সংগ্রহ করেছেন তিনি।

বৌদ্ধ ভিক্ষুণীর কণ্ঠধ্বনি বোধহয় লাজবতীকে পথ বলে দিয়েছিল।…

'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি···' লাজবতীর কণ্ঠধ্বনিতে মুগ্ধ হলেন ইন্দ্রনীল। প্রার্থনা-শেষে সে লাজনম্র মৃদু পদক্ষেপে এসে প্রণত হল ইন্দ্রনীলের সামনে।

সেই পরিচিতা বৌদ্ধ ভিক্ষুণী—শ্রাবন্তীমালা—তার কোলে একটি অপূর্ব সুন্দর শিশু!

ইন্দ্রনীল শিশুটিকে বুকে তুলে নিয়ে চুমো খেতে থাকলে লাজবতীর চোখের জল বাধা মানল না। লাজবতী বলল, 'আপনি আবার আসবেন আমি ভাবতে পারিনি। আজ আমি সত্যি নিজের সৌভাগ্যে গৌরব বোধ করছি।'

পকেট থেকে চাবিটা বার করে লাজবতীর হাতে দিতে সে বিস্ময়ে অভিভূত হল।

ইন্দ্রনীল বললেন, 'চলো, আমরা চলে যাই।'

ছেলেকে কোলে নিয়ে হিন্দুস্থান তিব্বত রোড ধরে টাট্টু ঘোড়ার পিঠে বসে লাজবতী অরণ্য পাহাড় মেঘ আকাশের দিকে তাকিয়ে মধুর কণ্ঠে গান গেয়ে গেয়ে আসছিল। তাদের পাহাড়ী দেহাতী গান।

ইন্দ্রনীল তাঁর সন্তানটির দিকে কেবলই তাকাচ্ছিলেন। এইটাই তাঁর আসল সৃষ্টি!···

"উত্তর গান্ধার"

স্মিত হাসি মুখে—ডান হাত তুলে বিনয়-সম্ভাষণ জানিয়ে যে তরুণটি প্রথমদিন দর্শনশাস্ত্রের ক্লাসে ঢুকল অবাক হয়ে তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ছিল সবাই। দেখার মতো চেহারা বটে! যেমন ফর্সা, তেমনি নাক-নকশা। এক কথায় রাজকুমার।

এগারোটা মেয়ে, সবাই যেন হন্যে হয়ে তাকাচ্ছিল ওর দিকে।

অধ্যাপক কৃষ্ণদাস গোস্বামী মিষ্টি হেসে ছেলেটিকে শুধোলেন, 'রৌশন আকতার, তোমার পরিচয়টা বলো—তুমি তো কাশ্মারী?'

'হাঁ স্যার, আব্বা কলকাতার নিউমার্কেটে কাশ্মীরী নকশাদার জিনিসপত্রের দোকানী; শ্রীনগরে আমাদের একটা হোটেল আছে; অনেক রকম ফুল-ফলের বাগিচা আছে; মা-ও কাশ্মীরী, তবে জম্মুর ব্রাহ্মণ-মেয়ে; আমি অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি থেকে গ্র্যাজুয়েট হয়ে মাসখানেক আমেরিকা ঘুরে কলকাতায় এসেছি। ইচ্ছা হল কলকাতা ইউনিভারসিটি থেকে দর্শনটা পাস করি।'—

'তুমি এত ভালো বাংলা জানলে কি করে?'

মৃদু হাসল তরুণটি। তার মুক্তোর মত দাঁতে নীলাভ আলো চমকাল। বলল, 'শিখে নিয়েছি স্যার। আব্বাও চমৎকার বাংলা বলতে পারেন। আমি কয়েকটি ভাষায় কথা বলতে পারি। ইংরেজী, কাশ্মীরী, হিন্দী, উর্দু, আরবী, ফার্সী, বাংলা ফরাসী জার্মান। শিক্ষিত ভদ্রলোক, পাঁচ সাতটা ভাষা অবশ্যই জানেন।'

'কত বয়স তোমার?'

পঁচিশ বছর স্যার।'

'কিন্তু তোমাকে তো দিব্যি আঠারো বছরের মতো দেখায়! নিতান্তই বালক!'

সবাই হেসে উঠে স্যারকে সমর্থন জানাল। তাদের সেই হাসির অর্থ দাঁড়াল যেন, কলকাতায় তুমি একটা নিতান্তই বালক মাত্র। এখানে অনেক রকম জীবন-যন্ত্রণা, গালঘুঁজি, খচ্চর লোকের আড্ডা!

রৌশন আকতার বলল, 'আমি বালকই তো স্যার, কাশ্মীরে বা যে সব দেশে ঘুরেছি সেখানের আবহাওয়ায় চট করে বুড়িয়ে যাই না, কিন্তু কলকাতায় এসে ভাবছি…'

অধ্যাপক হাসতে হাসতে বললেন, 'চট করে বুড়িয়ে না যাও!'

'বিশেষ করে দর্শন-ক্লাসে।' একটি মেয়ে টিপ্পনি কাটল। পরে রৌশন নাম জানল ওর—অমিতা রায়। চেহারা আর বেশবাসে চাকচিক্য আছে।

কদিন যাবার পর রৌশন আকতার একাই একশো হয়ে গেল যেন। সে এমনিতে বড় একটা কথা বলে না। কত কি হিজিবিজি

ভাষার বইপত্র এনে পড়ে। কিন্তু অধ্যাপক কিছু যদি জিজ্ঞেস করেন তো সে একাই আধঘণ্টা সময় নিয়ে বক্তৃতা করে। কান্ট, হেগেল, স্বয়েৎজার, নীট্‌শে, রাসেল যাঁর সম্বন্ধেই হোক— সে বেশ পা শুনো করেছে। একের বক্তব্যের সঙ্গে অন্যের মিল বা অমিলের তুলনা করে। আরবী আর ফারসী, জার্মান আর ফরাসী দার্শনিকদের কথাও বলে। ফলে সবাই তার বক্তব্যই মুগ্ধ হয়ে শোনে।

অমিতাভ চ্যাটার্জি একদিন তাকে সিঁড়িতে চেপে ধরল দেয়ালের সঙ্গে, ফাঁকা পিস্তল দেখাল, বলল, 'এই ব্যাটা মুসলমান কলকাতা থেকে পালাও, গুলি করে মারব। তোমার জন্য ক্লাশের মেয়েরা আমাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।'

কাঁধে হাত রেখে হাসল ছেলেটি। বলল, 'কাল সন্ধ্যায় আবার আমাদের দোকানে গিয়েছিল সবাই। আব্বা নকশাদার জিনিসপত্র দেখালেন। একটা গালিচার দাম লাখ টাকা! একটা কাঠের সিন্দুক দশ হাজার টাকা! বাঙালী মেয়েরা তো বোকার হাতা দেখার মতো অবাক! ভাই, আমি তো তোমাদের ঈর্ষার পাত্র নই।'

'হুম!' ভয় দেখাল অমিতাভ।

রৌশন পেটের কাপড় তুলে ধরল। 'মারো! কুছ্‌পরোয়া নেই। আমি লণ্ডন নিউইয়র্ক ঘুরে আসা মাল - ভয় পাই না।'

রৌশন আকতার সবুজ রঙের দামী একটা মোটরে চড়ে আসে। তাকে নামিয়ে দিয়েই গাড়িটা চলে যায়।

রাজনৈতিক বোমবাজির জন্য সেদিন ইউনিভারসিটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পাঞ্জাবি পাজামা পরা রৌশন বাইরে এসে হেয়ার স্কুলের মওলানা মসিউর রহমানের সঙ্গে কথা বলছিল। ক্লাসের ছেলেমেয়েরা এসে জুটল। আরবী না ফার্সীতে ওরা কথাবার্তা বলছে বুঝল না কেউ।

অমিতা বলল, 'প্লিজ, কিছু মনে করবেন না মওলানাজী, আমরা কাশ্মীরী এই ভদ্রলোকটিকে আপনার কাছ থেকে এখন হাওলাৎ নিতে চাই।'

মওলানা বললেন, 'বেশক। আমি কিন্তু ওর জিম্মাদার নই, সুবাদে আমি ওর বাবার বন্ধু 'চাচাজী' মাত্র! খুশিতে মওলানা সাহেব একেকার।

'কোথায় যাবো কোথা –!' রৌশন টানাটানিতে বাগড়া দিল।

'কফি-হাউসে, কফি খাওয়াবে আজ।'

'কিন্তু আমি তো আজ তেমন বেশী কিছু আনিনি!'

অমিতা বলল, 'তাহলে চলো, আমি খাওয়াচ্ছি।'

অমিতাভ বলল, ওর বাপের চটকল আছে।'

আর একজন বলল, 'সেখানে কেবল ধর্মঘট হয়।'

অমিতা অঙ্গ দোলাতে দোলাতে বলল, 'তারপরই লক আউট। সেটা আমরাই তোমাদের দিয়ে করাই, নইলে মাল জমে গেলে কি করব?'

'আমাকে যদি খালাসীর কাজ দাও, মাল জমে গেলে খালাস করে দিই।' বক্তার নাম সুবোধ। স্ল্যাং ছাড়া কথা বলে না সে। তার আর একটা নাম খিস্তিবাজ।

কিন্তু কফি-হাউসের দোরগোড়া পর্যন্ত এসে রৌশন বিগ্‌ড়াল। বলল, 'আমি যাব না, প্লিজ।'

'কেন?'

'আমার ওখানে একদম ভাল্লাগে না। মনে হয় পাকা তালে মাছি ভন্‌ভন্ করছে। সময় নষ্ট। তাছাড়া এই গরম আবহাওয়ায় আমি কফি খাই না।'

'ছেড়ে দে তো।' অমিতাভ বলল। 'আমরা তালের মাছি আর ও সোনা ব্যাঙ!'

রৌশন সত্যিই গেল না। পুরোনো বইএর দোকানগুলোয় কিছুক্ষণ কত কি বই দেখল। কিনল না কিছুই। বই-দোকানী বিদ্রূপ করল। অন্য কোন দেশে এটা করে না। আমেরিকায় চারদিন ধরে দেখতে দেখতে একটা বই প্রায় পড়া হয়ে আসতে এক মহিলা সেল্‌স্‌ম্যান মিষ্টি হেসে বলল, 'খুব ইন্টারেস্টিং বই, না? ক'দিনই দেখছি ওটা

পড়ছেন, যদি মানি শর্ট হয় তাহলে আমি কিনে আপনাকে প্রেজেণ্ট করতে পারি ।'

লজ্জা পেয়ে বইটি বিশ ডলারে কিনে নিয়েছিল রৌশন। বইটি কিন্তু নুড সম্পর্কিত। আর্ট পেপারে মেলা ছবি। নিষিদ্ধ জীবনের অদেখা আকর্ষণ।

বাঁধা বই-দোকানীটি হঠাৎ রৌশনকে দেখে ডাক দিলেন। তিনি নাকি একজন প্রকাশক। বললেন, 'কই নুডের সেই বইটি এনে বেচে দেবেন বলেছিলেন যে···'

'কি জানেন, এনেছিলাম আমি। ক্লাশের একটি মেয়ে নিয়ে গেছে।'

'আর আপনার যা চেহারা, মেয়েরা তো নেবেই।' প্রকাশক ঠাট্টা করলেন।

চলে আসতে আসতে হঠাৎ কিসে বেধে যেন হোঁচট খেল রৌশন। স্যাণ্ডেলের স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে গেল। রাস্তার ওপারে মুচিটার কাছে গিয়ে জুতো সারতে দিয়ে বসে বসে তার সঙ্গে কথা বলতে লাগল। মুচির বাড়ি গয়া জেলায়। তারা জলচল নয়। হরিজন বুড়ো খানিকটা লেখাপড়া জানে। রাত্রে 'লেডি বাগানে' গরম চা আর সিদ্ধ ডিম বেচে। দেশে বউ ছেলেমেয়ে আছে। ক্ষেতি আর ভইষা আছে। বড় ছেলে বি এ. বি. টি. পাস করে এলো অন্য জিলা থেকে। নিজের জিলার কলেজে ভদ্দরলোকের ছেলেমেয়েদের পাশে নাকি বসতে দিত না। উ ছেলে ছোটলোকদের নিয়ে স্কুল গড়ল। তারপর তাকে ভদ্দর আদমীরা মেরে দিল বাবু - আমরা হরিজন, নিচু জাত আছি।'

'আরে রৌশন, তুমি মুচির সঙ্গে বসে গল্প করছ—আর কফি হাউসে আমাদের সঙ্গে আড্ডা তোমার ভাল লাগল না!' ছেলেমেয়ের দল এসে ঘেরাও করল।

'গোবর-গাদায় পদ্মফুল খুঁজছ নাকি?'

জুতো সারা হতে 'কত দিতে হবে' শুধোতে মুচি বলল, 'দিন বাবু যা খুশি।'

এ পকেট সে-পকেট খোঁজার পর রৌশন বুকের ভেতর থেকে

একশো টাকার নোট বার করল। খুচরা নেই। মুচির কাছে থাকা তো সম্ভব নয়। থাকলেও সে বার করবে না, কেড়ে নেবার ভয়ে।

'ওর কাছে নাকি টাকা ছিল না!' বলল সুবোধ, 'আসলে বাঙালী এই সব সুন্দরীরা ওর মন যতখানি টানতে পারে তার চাইতে টানে রাস্তার ঐ মুচি!'

বিদ্রূপকারী দোকানদারটির কাছ থেকেই একটা পুরোনো বই কিনে খুচরো করে এনে পাঁচটা টাকা দিয়ে দিল রৌশন। কিছু ফেরত দেবার জন্যে মুচি তবিল খুলতে গেলে সে হাত নেড়ে জানাল, থাক আর দিতে হবে না।

প্রথম বছরের ফাইনাল পরীক্ষায় রৌশন প্রথম হল। এটা সবাই আন্দাজ করেছিল। ওর ইংরেজী জ্ঞান আছে। ও তরল নয়, গম্ভীর। বিদ্যে আর অর্থ আছে, তার ওপরে রূপ লাবণ্য। দেমাক তো একটু হবেই।

কিন্তু রৌশন জানে সে খুবই সরল। ওরাই বরং জড়ি-জক্কড়। একদিন অমিতাকে বলল, 'নুডের বইটা তো দিলে না?'

'না দিলেই কি নয়? কেন, ওটা দিয়ে কি তোমার অতৃপ্ত বাসনা-কামনাকে তৃপ্ত করো?'

'ওর চেয়ে আমি প্যারিস, লণ্ডন, নিউইয়র্কে অনেক জ্যান্ত ছবি দেখেছি। ছবির জন্যে নয়, ওতে কিছু দামী প্রবন্ধ আছে। অনেক বিখ্যাত লোকের প্রেম-কাহিনী আছে। তুমি বইটা দিও।'

'দামটা নিয়ে নাও।'

'সেরকম তো কথা ছিল না। বাঙালীদের চরিত্রই আলাদা—যা বলে তা করে না।' মোটর হাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল রৌশন।

রৌশনের বিরুদ্ধে একটা ঘোঁট পাকিয়ে তুলল ক্লাশের কেউ কেউ।

সুবোধ বলল অধ্যাপক কৃষ্ণদাসকে, 'স্যার, ঐ কাশ্মীরী ছেলেটা বলে আপনি নাকি কিছুই জানেন না। আপনি নাকি কলকাতার একটা বুড়ো খ্যাকশিয়াল।'

'তাই নাকি! স্টুপিড! ওর সামনে মনে করে দেবে তো!'

সব স্যারের নামেই ওরা এই রকম করে মিথ্যে নিন্দেমন্দ করল।

সব স্যারই ওর ওপরে চটলেন। সকলেই ওকে আড়াল ডেকে কথা বললেন। রৌশন বলল, 'এসব কথা আপনি বিশ্বাস করেন? কলকাতার আবহাওয়ায় এটা হয়তো সম্ভব। ছেলেমেয়েরা আমার পেছনে লেগেছে। বিশ্বাস করুন স্যার, আমি এসব কিছুই জানি না। আপনারা গুরুজন··।'

কিন্তু মানুষের মন বোধহয় কাঁচ বা মাটির হাঁড়ি-কলসির মতন চিড় খেলে আর জোড়া লাগে না।

সমস্ত অধ্যাপকই যেন রৌশনের ওপর বিরূপ হয়ে গেলেন।

আগে প্রশ্নের উত্তর দিতে উঠে রৌশন অনেক কিছু বলত, এখন আর সুযোগ পায় না।

অধ্যাপক কৃষ্ণদাস একদিন ধাতানি দিলেন, 'তুমি থামো তো ছোকরা, বাচালতা করো না, ফিলসফি অত হালকা বিষয় নয়। যা জিজ্ঞেস করছি শুধু তার উত্তর দাও।'

রৌশন বুঝেছিল এখান থেকে সে আর ভাল রেজাল্ট করতে পারবে না। সবাই তার বিরুদ্ধে জোট পাকিয়েছে। অমিতা শুধু মাঝে মাঝে করুণ চোখে তাকায়। কিন্তু ও যখন সেকেণ্ড হয়েছে, তখন ওরও তো চক্রান্ত হতে পারে।

রৌশনের বাড়িতে একদিন এলো অমিতা, বই দিতে। রৌশনের মা আর বোন এসেছে। তাদের দেখল অমিতা। কী সুন্দর দেখতে ওঁরা। তাকে কত কী খাওয়ালেন রৌশনের মা। গাল দুটো ওঁর এমনিতেই লাল!

বই দেবার পর অমিতা বলল, 'শুনলাম, তুমি নাকি ফাইন্যাল দেবে না?'

'হ্যাঁ।'

'হ্যাঁ মানে কি, দেবে?'

'না।'

'সেই ভাল।'

'কেন একথা বলছ ?'

'ছেলেরা নাকি সব প্রফেসারকেই শাসিয়েছে তোমাকে হীরো করলে জিরো মারবে। মানে গোল গোল—বোমা !'

'ছেলেরা তো ঐ কথা বলে, মেয়েরা ?'

'মেয়েরা ওর মধ্যে নেই।'

'তারা কোন পার্টি ?'

'তারা নিরুপায়, বাঁকা 'এস'-এর দলে।'

কিন্তু ফাইন্যাল পরীক্ষা দিল রৌশন আকতার। আর আশ্চর্য, সে-ই ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট হল।

কনভোকেশনে ডিপ্লোমা নেবার দিন অনেকের সঙ্গে দেখা হল। রৌশনের সঙ্গে এসেছে একটি কাশ্মীরী তরুণী আর তার ভাই। অসামান্য রূপবতী মেয়েটি। আলাপ করিয়ে দিল সকলের সঙ্গে। 'এর নাম শিরিন। মস্ত ধনী লোকের মেয়ে, এটা ওর ভাই।'

'একে বিয়ে করবে নাকি তুমি ?'

'সেই রকমই তো কথা আছে।'

বাঙালী মেয়েগুলো যেন আগুন দেখে ভয়ে পেছিয়ে গেল।

অমিতা বলল, 'তাই তুমি আমাদের দিকে তাকাতে না !'

হাসল রৌশন। শিরিন তাকে শুধোল নিজের ভাষায়, মেয়েটা কি বলল। রৌশন বুঝিয়ে দিল। পাতাল-চোখ করে শিরিন একবার ঠোঁট ওল্টাল। এই বিদ্রূপে বাঙালা কালো, শামলা রঙের মেয়েগুলোর মাথায় যেন চাঁটি পড়ল।

খাওয়া-দাওয়ার খরচ দিল রৌশন। মেয়েরা পিছু লাগল শিরিনের। সবাই লক্ষ্য করছে, শিরিন বোধ হয় তেমন লেখাপড়া জানে না। আদৌ ইংরেজী বলতে পারে না। ফটো তোলার সময়ও হাতের রেশমী ওড়না দিয়ে মুখ আড়াল করছিল।

অমিতা সুযোগ বুঝে মুখ খুলল, 'গেঁইয়া নাকি ? শুধু মাংসের দর ? কত প্রপার্টি পাবে ?'

রৌশন কিছু বলল না। যাবার সময় বলল, 'মাংস হলেও পবিত্র।

আর ও ইংরেজী না জানলেও আরবী ফারসীতে বিদুষী।'

ওরা চলে যাবার পর অনেকক্ষণ গুলতানি পাকাল সকলে। মায়া-হরিণ যেন জাল কেটে পালিয়ে গেছে।

অমিতা ফার্স্ট ক্লাশ সেকেণ্ড হয়েছে, তার অনেক নিচে অমিতাভর নম্বর। আর সুবোধ একেবারে সেকেণ্ড ক্লাশের তলায়। তবে সেইই সবার চেয়ে খুশী। বলল, 'আমি কি করে পাস করে গেলাম ভাবতে পারছি না। ফেল করলে বাপের অন্ন ধ্বংসাতাম—এখন কোথায় চাকরি বা মাস্টারি পাব?'

আর এক মিল-মালিকের ছেলের সঙ্গে বিয়ে হবে অমিতার। বাবা-মা ঠিক করে দিয়েছেন। ছেলে অবশ্য আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েট। কিন্তু ওদের অনেক টাকা। বিদেশেও ব্যবসা-বাণিজ্য আছে।

অমিতা ছেলে দেখে অখুশী হয়নি। একটু মস্তানি চাল আছে। মেঠো মেঠো মনে হয়। ব্যবসায় থাকলে নাকি ওরকম হয়। দেখতে এসেই একা পেয়ে কাছে টেনে চুমো খেতে গেল। লজ্জায় বাধা দিলে অমিতা। না দিলে পরে ভাববে—এ মেয়ে ভাল ছিল না, এত সহজ-লভ্যা হল কেন? হীরের লকেট দেওয়া পাঁচভরি সোনার হার গলায় পরিয়ে গেছে রাখোহরি চাকলাদার। ঐ রকম নাম ওর। যেন নোনতা সন্দেশ! তবে মায়ের খুব পছন্দ। তাঁকে হাত করেছে রাখোহরি।

একটা আবেগে ভাসছিল যেন অমিতা। বিয়েটা নাকি তার একার নয়। পারিবারিক ব্যাপার! মাসীপিসীরাও হুল্লোড় পাকিয়ে তুলেছেন। তত্ত্ব যাচ্ছে ও বাড়িতে।

সঙ্গিনী মাধবীকে নিয়ে নিউমার্কেটে কিছু কেনাকাটা করতে এসেছিল অমিতা। কাশ্মীরীদের দোকানের সামনে দিয়ে পথ চলার সময় হঠাৎ রৌশনদের দোকানটার দিকে তাকাতেই চোখ পড়ল তার বাবাকে।

দেবদর্শন সেই বৃদ্ধ হাঁক দিলেন সাদা দাড়িতে নীলাভ দাঁত ঝিলমিলিয়ে, 'হ্যাল্লো! কাম অন মাই ডিয়ার ডটার। চলে এসো এখানে—এটা শান্তির জায়গা।'

কাছে গেল অমিতা। কাঁধে হাত রাখলেন অপূর্ব সুন্দর প্রৌঢ় ভদ্রলোক। বললেন, 'চা বিস্কুট খাও। বসো মা-মণি! সন্দেশ খাও, কাজুবাদাম, কিশমিশ খাও।'

'রৌশন কোথায়?'

দেশে গেছে। আসবে আর চারদিন পরে। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রফেসারি করবে বলছে। আমি যে তার শান্তির আশ্রয়—এখানে না এসে পারবে?'

'সেই শিরিনের সঙ্গে বিয়ে হবে?'

'না মা-মণি—হবে না।'

'কেন?'

'সে কলকাতায় এসে, ওর সঙ্গে কনভোকেশনে গিয়ে বাঙালী মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা দেখে আর তাকে তারা 'অশিক্ষিতা গেঁইয়া' বলতে মহা ক্ষেপে গেছে। তার মা-বাবাকে বলেছে রৌশন নাকি খারাপ। কলকাতায় এলেই নাকি সবাই 'দুশ্চরিত্র' হয়ে যায়। বড়লোকের মেয়ের খেয়াল। ম্যাট্রিক পাসও করেনি।'

'ঠিক আছে, ও এলেই যেন আমাকে ফোন করে—এই যে ফোন নম্বর—প্লিজ, বলবেন, এঁ্যা! বাবুজী সালাম!'

চা খেয়ে বিদায় নিল অমিতা।

মাধবী বলল, 'কি সুন্দর না বুড়োটা!'

'বাবা!' অস্ফুটে শুধু বলল অমিতা। সে বড় অন্যমনস্ক।

অমিতা অধীর অপেক্ষায় ছিল। চারদিন সে কারো সঙ্গে তেমন ভাল করে কথা বলল না। মা উদ্বিগ্ন। বাবাও।

হঠাৎ ফোন এলো। রৌশনের ফোন।

'এই, কি হল? কেমন আছ? তোমার মা হিন্দু না? এই জানো, আমার তোমার মতো একটা গবেট ফেলোর সঙ্গে বিয়ে হতে যাচ্ছে।' অমিতা হাঁপিয়ে, স্বচ্ছন্দ হবার ভঙ্গি করে বলে ফেলল।

'কোরো না।' বলল রৌশন।

'কেন?'

'কি হবে বিয়ে করে ?' গম্ভীর গলার স্বর রৌশনের।

'সোনার সংসার, প্রেম ভালবাসা !'

'ঠিক আছে, তবে করো।'

'না, করব না।' অভিমান-ক্ষুব্ধ গলার স্বর অমিতার।

'কেন ?' কৌতুক, কৌতূহল রৌশনের গলায়।

'মনের মানুষ না হলে কি আর বিয়ে করা যায় ?'

'পৃথিবীতে যত মানুষ বিয়ে করেছিল সবাই কি সবায়ের মনের মানুষ ছিল ?'

'জানি না, হবেও বা। শুনলাম, তুমি নাকি কলকাতাতেই থাকছ, প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রফেসারি করছ ?

'খবরটা ঐরকম। আব্বা তাই চান। কলকাতা তাঁকে যাদু করেছে। এখান থেকে আর নড়বেন না। আর তাঁর আরো একটা আধুনিক শখ বাঙালী শিক্ষিতা মেয়েকে নাকি বউমা বানাবেনই।'

মেরে হাড় ফাটিয়ে দেবো। পাহাড়ী কাশ্মীরী হয়ে অবলা বাঙালী মেয়েকে বিয়ে করা !'

হা হা করে হাসতে লাগল রৌশন। বলল, 'জানো, আমারও পিতৃদোষ আছে, বাঙালীদের গান, নাচ, ভাষা, কথা বলা, সাজ-পোশাক, সাহিত্য খুব ভাল লাগে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমার প্রাণের কবি, শুনবে একটা কবিতা ?'

'থাক। জীবনের বাস্তবতার সঙ্গে আমি যখন লড়াই করে মরছি, তখন তোমার রোমান্টিক কবির কবিতা শুনে লাভ নেই।'

'মা বলেন বাঙালী মেয়েদের চোখ দুটো বড় সুন্দর। যেমন তোমার।'

'ওমা ! আমার চোখ তো বড় বড়—গরুর মতন ! তোমার মা'র বোধ হয় এখনো হিন্দুপ্রীতি যায় নি।'

'হিমালয় থেকে আসা এক হিন্দু সাধকের কাছে মা রুদ্রাক্ষের মালা নিয়েছেন। নামাজের পর সেটা তিনি তস্‌বিহ রূপে গোনেন।'

'তোমার মা বড় ভাল ! বাবাও !'

'তাঁরা তোমাকেই চয়েস করেছেন।'

'কি বললে?'

'বাই। কেটে দিই।'

ফোনটা রেখে দিয়ে হঠাৎ অমিতা দৌড়ে এসে মায়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল, 'মা, আমি বিয়ে করব না।'

অমিতার মা ভাবলেন, মেয়ে পাগল হয়ে গেছে। তিনি গজ গজ করতে লাগলেন, 'মেয়েদের বেশি লেখাপড়া শেখানোই পাপ।'

—